শ্রীশ্রী রামঠাকুর

অরুণাংশু হোর

শ্রীশ্রী রামঠাকুরের আবির্ভাব হয়েছিল এক যুগসন্ধিক্ষণে। বৈদেশিক বাতাসে তদানীন্তন নব্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের চঞ্চল আর শিক্ষিত মন অনেক কিছু জানতে চাইতো। মিথ্যা ভেদগণ্ডির প্রতি একটা বিদ্বেষভাব শিক্ষিত মনকে অস্থির করে তুলেছিল। তাই হয়তোবা বিশ্বপিতা তাদের ব্যাকুলতায় চঞ্চল হয়ে বিশ্বমানবতার ক্ষুধা মেটাতে নরদেহ ধারণ করে কৈবল্যনাথ অবতারে আবির্ভূত হয়েছিলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের জীবনী একটা জীবন্ত গীতা, নিষ্কাম ধর্ম, আর সন্ন্যাসের জীবন্ত বিগ্রহ - বেদান্তের এক প্রাণময়ী মূর্তি। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের ত্রিবেণী সঙ্গম।

এই ঘটনাটি ঘটেছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম চিরতরে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার অল্প কিছুদিন আগে। সকাল দশটা কী সাড়ে দশটা হবে কাজী নজরুল আর্লস্ট্রিটে কুঞ্জ বাবুর বাড়ির এক তলার ঘরে ঢুকলেন। তখন কুঞ্জ মজুমদার বাবুর বাড়ির এক তলায় সপরিবারে বাস করতেন সদানন্দ চক্রবর্তী মহাশয়। কবিকে দেখে সদানন্দ বাবু করজোড়ে আহ্বান করে তাঁর বৈঠকখানায় নিয়ে বসালেন। কবির হাতে একটা থলে দেখে সদানন্দ বাবু ভাবলেন হয় ত বাজার করতে বের হয়ে তিনি চলে এসেছেন। খেয়ালি কবির ভাবসাব তাঁর ভালই জানা ছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের বাড়িতে যাতায়াতের সময় সদানন্দ বাবুর সাথে কবির আলাপ পরিচয় ঘটে। শুধু তাই নয় সে সময় তাঁকে কয়েকবার কাজী সাহেবের বাসা বাড়িতেও যেতে হয়েছিল। কবিকে বসতে দিয়ে সদানন্দ বাবু বললেন, 'কাজীদা কী মনে করে আমার মত দীন হীনের ঘরে আগমন?'

শুনে কবি নজরুল বলেছিলেন, রাজা যদি হয় হীন, প্রজা হয় দীনের দীন। তুমি না রামঠাকুরের ভক্ত শিষ্য, দীন হতে যাবে কেন? তুমি তো দীন দুনিয়ার রাজার প্রজা। দাওনা একবারটি দর্শন করিয়ে। শুনলাম মজুমদার মশায়ের ঘরে রামঠাকুর মশায় সশরীরে আছেন। কবির কথা শুনে সদানন্দ বাবু বিনয়ের সাথে বললেন, কাজীদা আজই আপনি আসার ঘণ্টা খানেক আগে প্রধানমন্ত্রী হক সাহেব (তখন অখণ্ড বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হত) এসে ঠাকুরের দর্শন কামনা করেছিলেন। ঠাকুর মশায় তাঁকে দর্শন দেন নি এই বলে, "রাজা উজিরদের এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কাছে কোন দরকার আছে বইল্যা তো আমার জানা নাই।" লোক মারফত কথাটি শুনে হক সাহেব চলে যান। কথাগুলো শুনে অত্যন্ত নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন কবি। সদানন্দ বাবু কাজীদার প্রিয় আহার্য চা এবং পানের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু চা পান শেষ করার আগেই ওপর থেকে একজন এসে বললেন, 'এখানে কে একজন মুসলমান কবি এসেছেন তাঁকে ঠাকুর যেতে বললেন।' কাজীদা কাল বিলম্ব না করে সদানন্দ বাবুর দিকে একবার ছল ছল চোখে তাকিয়ে উপরে উঠে গেলেন। সদানন্দ বাবুও কবির পেছনে পেছনে গেলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরকে দর্শন ও প্রণাম করে অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত পেতে ঠাকুরের শ্রীমুখপানে মিনতি ভরা চোখে তাকিয়ে থাকলেন। মুখে কিছুই বললেন না। কবির করুণ দৃষ্টিপূর্ণ মুখের দিকে চেয়ে, "এ জন্মে নয় পরের জন্মে হইব।" এই বলে গুরুদেব চুপ হয়ে গেলেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথা শুনে বিদ্রোহী কবি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে হাঁটু মুড়ে করজোড়ে তখন একটা গান গাইতে শুরু করলেন। তৎক্ষণাৎ রচিত কবির গানের ভাষা এবং সুর এতই হৃদয় বিদারক ছিল যে উপস্থিত সকলের চোখ জলে ভরে উঠেছিল। গান গাওয়ার সময়ে বিদ্রোহী কবির দুই চোখে ছিল সজল অশ্রুধারা। অন্যদিকে তখন শ্রীশ্রী ঠাকুর স্থির অচঞ্চল অবস্থায় যেন ধ্যানমগ্ন। ওই ঘটনার কিছুদিন পরেই কবি কাজী নজরুল ইসলাম বাকরুদ্ধ হয়ে গেছিলেন।

> শিশু কিংবা যুবক-যুবতী, বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি বাড়ির ঝি-চাকর, রাস্তার কুলি-মজুর, যাদের আমরা সাধারণত তাচ্ছিল্যভরে 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করি, তাদেরও ঠাকুর 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন আর স-সম্মানে নিজের কাছে এনে বসাতেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের অন্য একজন ভক্ত শ্রী উপেন্দ্র কুমার সাহা চৌমুহনীতে প্রতি বৎসর অতি সমারোহে ঠাকুরের ঝুলন উৎসব করতেন। এরকম এক ঝুলন উৎসবে পূর্ণিমায় দিনের বেলায় মহোৎসব হচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। বর্ষাকাল। ভোগের পর হাজার খানেক লোক মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। উপেনবাবু তাই অস্থির হয়ে অন্য এক ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, কি হবে এখন?" তিনি বললেন, "ঠাকুরকে ডাকুন, আর কোন উপায় নেই।" ভক্তের ডাকে ঠাকুর সাড়া না দিয়ে পারেন নি। অবাক হয়ে তখন সবাই দেখলেন, উপেন বাবুর বাড়ির চারপাশে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনের মুক্ত প্রাঙ্গণে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না। জীবনে এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য সেখানে উপস্থিত অনেকেরই হয়েছিল। ঠাকুরের কি মহিমা! সবাই তখন চোখের জলে বার বার শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রণাম জানালেন।

সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। ঠাকুর সেই সময় সবার প্রাণে সাহস দেয়ার জন্যে চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন। তিনি একটি সরকারি বাসভবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সাইরেন বাজালেই সবার ট্রেঞ্চে গিয়ে আশ্রয় নেওয়ার নির্দেশ ছিল। একদিন হঠাৎ সাইরেন বেজেছে, তাই ঠাকুরের সামনে উপস্থিত ভক্তদের ট্রেঞ্চে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে বাড়ির মালিক অুরোধ করার পর ঠাকুরকেও ট্রেঞ্চে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর তখন বললেন, "এই আদেশ আপনাদের জন্য, আমার জন্য নয়। আপনারা যান। আমার মাথায় বজ্র পড়িবে, সেই বজ্র আজও তৈয়ার হয় নাই। বোমা এখানে পড়িবে না, দুই একটা এদিক সেদিক পড়িবে। যাহারা সত্যকে ধরিয়া সত্যনারায়ণের আশ্রয়ে থাকিবে তাহাদের কিছু হইবে না।" দেখা গেল, আসলেই সেদিন শুধু ৩/৪টি বোমা পড়েছিল। কিন্তু বাড়ির সীমানার মধ্যে একটিও পড়েনি। এ থেকেই বোঝা যায় যে ঠাকুর তাঁর আশ্রিতদের প্রতি কত দয়ার্দ্র এবং তাদের কতভাবেই না রক্ষা করে থাকেন।

একবার সাউথ সাবার্বান স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মজুমদার সৌভাগ্যক্রমে শ্রীশ্রী ঠাকুরের সাথে পুরী যাবার সঙ্গী হয়েছিলেন। ঠাকুরের সাথে পুরীধামে থাকাকালে একদিন অক্ষয় বাবুর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের

সন্ধ্যারতি দেখার ইচ্ছে জাগে। অক্ষয় বাবু তাঁর ইচ্ছের কথা ঠাকুরের কাছে নিবেদন করলে ঠাকুর তাতে সম্মত হয়ে তাঁকে নিয়ে সন্ধ্যের আগে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের মন্দির দ্বারে গেলেন। শ্রীমন্দিরের প্রধান ফটক সিংহদ্বার, যেখানে শ্রীঅরুণস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত আছেন সেখানে ঠাকুর দাঁড়িয়ে অক্ষয় বাবুকে আরতি দেখার জন্যে শ্রীমন্দিরে যেতে বললেন। তখন সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেছে। কাঁসর ঘণ্টাসহ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের সুগম্ভীর ধ্বনিতে মন্দির প্রাঙ্গণ গমগম করছিল। সুগন্ধি ধূপ, কর্পূর, চন্দন, অগুরু ইত্যাদির গন্ধে চারদিক আমোদিত। অক্ষয় বাবু আরতি দেখার জন্যে শ্রীমন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। জগন্নাথদেবের সন্ধ্যারতি তখন নানা উপাচারে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরে চলত। অক্ষয় বাবু শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও প্রণাম শেষে কিছুক্ষণ আরতি দেখার পর, ঠাকুর মন্দির দ্বারে একা আছেন ভেবে সিংহদ্বারের কাছে ফিরে আসলেন। অরুণ স্তম্ভের কাছে এসে অক্ষয় বাবু দেখলেন, ঠাকুর স্থিরভাবে স্তম্ভমূলে দাঁড়িয়ে আছেন, আর দীন মলিন বেশের এক বৃদ্ধা একটা থালায় ছোট ছোট কিছু প্রদীপ দিয়ে শ্রীশ্রী ঠাকুরের আরতি করছেন। তখন শ্রীমন্দিরের ভেতর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খ, ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছিল। বৃদ্ধা মহিলা প্রজ্বলিত প্রদীপে সজ্জিত থালাটি দুই হাতে দুলিয়ে নানা ভঙ্গিতে, নানা মুদ্রায়, তন্ময় হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীশ্রীরামঠাকুরের আরতি করেই যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন পলকহীন দৃষ্টিতে প্রস্তর মূর্তির মত ধীরস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি যেন ধ্যানস্থ এক বিগ্রহমূর্তি। যতক্ষণ শ্রীমন্দিরে আরতি চলছিল ততক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধা সেই একই প্রদীপ্ত দীপের থালা দুলিয়ে আরতি করেই গেলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে। অক্ষয় বাবু একটু দূরে থেকে ওই আরতি দেখছিলেন। তিনি আর সামনে যাননি পাছে তাঁর উপস্থিতিতে কোন ব্যাঘাত ঘটে। এইভাবে বহুক্ষণ ধরে আরতি হল। কিন্তু ছোট ছোট প্রদীপের শিখা সমানভাবে প্রদীপ্ত ছিল। একটি দীপও নেভার কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। এতে আশ্চর্য হয়ে যান অক্ষয় বাবু। যাই হোক, যথাসময়ে শ্রীমন্দিরের সন্ধ্যা আরতি শেষ হল। মলিন বেশধারিণী অজ্ঞাত সেই বৃদ্ধা রমণীও তার আরতি শেষ করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যান। অক্ষয় বাবু বৃদ্ধাকে আর দেখতে পেলেন না। তিনি ঠাকুরের সামনে এসে দেখেন ঠাকুর আগের মত স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কৌতূহলবশে অক্ষয় বাবু ঠাকুরকে বৃদ্ধার আরতি করার কথা জিজ্ঞেস করলে ঠাকুর বললেন, ভিড়ের মধ্যে হয়তো কেউ মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে না পেরে বাইরে দাঁড়িয়ে শ্রীজগন্নাথদেবকে আরতি করছিলেন। তাঁকে কেউ আরতি করেনি। অক্ষয় বাবু ঠাকুরের এই কথা মানতে পারলেন না। কারণ তিনি সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে স্পষ্টভাবে দেখেছেন। ভুল হবার কোন কারণই নেই। কিন্তু ঠাকুর এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব না দিয়ে চুপচাপ বাড়ির দিকে রওনা হলেন। অক্ষয় বাবুও তখন চুপচাপ ঠাকুরকে অনুসরণ করতে লাগলেন।

একবার এক চিকিৎসক তাঁর কর্মবহুল জীবনে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে হরিদ্বারে এসেছিলেন। একদিন হৃষিকেশ এসে সন্ধ্যে হবার আগে জঙ্গলের রাস্তা ধরে একা আপন মনে হাঁটছিলেন। কোলাহলহীন সেই পরিবেশে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে তাঁর ভালই লাগছিল। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই যে গাঢ় হচ্ছিল আনমনা ডাক্তারের সেদিকে খেয়াল ছিল না। হঠাৎ সামান্য বস্ত্রে ঢাকা শীর্ণদেহী এক বৃদ্ধ তাঁর সামনে এসে বললেন, 'আর আউগাইবেন না সন্ধ্যা হইছে এখনই নানান জন্তু জানোয়ার নাইমা আসব।' বৃদ্ধের সাবধান বাণীতে সম্বিত ফিরে এল সেই ডাক্তারের। তিনি দেখলেন, সত্যিই সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ফিরে যেতে অনেক রাত হয়ে যাবে। এই ভেবে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করে যাবেন? আপনারও তো ভয় আছে জন্তু জানোয়ারের? উত্তরে বৃদ্ধ বললেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ।" এই শুনে ডাক্তার হেসে বললেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তো হিংস্র জানোয়ার আর ছেড়ে দেবে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন বললেন, ভগবানের নাম করলে কোন ভয় নেই। এই বলে ব্রাহ্মণ একটা ঈশ্বরীয় নাম বলে বনানীর একটি ছোট পথে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কোন কিছু বোঝার আগেই বৃদ্ধকে অদৃশ্য হতে দেখে ডাক্তার বিমূঢ়ের মত ব্রাহ্মণের যাবার পথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করলেন। ফিরে আসতে তাঁর অনেক রাত হয়ে গেছে। রাতে বনের মধ্যে ভয় পাবারই কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ওই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা আর তাঁর দেওয়া মন্ত্রের কথা চিন্তা করতে করতে আসাতে তাঁর কোন ভয় ডরই আসেনি ঐদিন। এই ঘটনার প্রায় দুই বছর পরে তিনি কলকাতায় একজন মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসার ডাক পেয়ে সেই রোগীর ঘরে এসে ঘরের দেয়ালে একটা ছবি দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, এই দেয়ালে ওই ছবির ভদ্রলোক আপনাদের কে হন? ইনি আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীরামঠাকুর। ডাক্তার বাবু তখন বললেন, তিনি এখন কোথায় আছেন? এখন তিনি নেই, কয়েক বছর আগে তিনি দেহ রেখেছেন। ডাক্তার বাবু জিজ্ঞেস করলেন, কতদিন আগে দেহ রেখেছেন? তা প্রায় ছয় সাত বছর হবে। এইশুনে বিস্মিত ডাক্তার বাবু বড় বড় চোখে বললেন, 'অসম্ভব, হতেই পারে না, আপনার হিসেবে ভুল হচ্ছে, দুই বছরও হয়নি হৃষিকেশের জঙ্গলে উনার সাথে আমার দেখা হয়েছে। রাতের অন্ধকারে আমার ভয় দূর করতে একটি মন্ত্রও আমায় দিয়েছিলেন তিনি।' এই বলে ডাক্তার তখন সমস্ত ঘটনা তাঁদের বললেন। সব শুনে সেই বাড়ির সবাই ডাক্তারবাবুকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। গৃহকর্তা বললেন, 'ডাক্তার, জন্মান্তরের সুকৃতিতে আপনি ঠাকুর রামচন্দ্রদেবের কাছে দীক্ষা মন্ত্র পেলেন তাঁর প্রকট লীলা সংবরণের পরে।' দয়াল গুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুর আজ অব্দি এইভাবে সূক্ষ্মদেহে অনেককেই নাম দিয়ে যাচ্ছেন।

আর একদিনের ঘটনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম ভক্ত ফণীবাবু স্বয়ং ঠাকুরের কাছ থেকে আরাধ্য নাম পাবার কিছুদিন পর এক গভীর রাত্রে হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম থেকে জেগে ঘরের কোণে রাখা হারিকেন ল্যাম্পের আলো বাড়িয়ে দেখলেন, তাঁর স্ত্রীর গলা থেকে একটা ঘড়ঘড় শব্দ বেরুচ্ছে। তিনি স্ত্রীর খাটের কাছে গিয়ে জোরে জোরে ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙ্গান। ফণীবাবুর স্ত্রী তখন ঘুম থেকে উঠে বললেন, "ঠাকুর আমাকে নাম দিয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন আর তখন তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গিয়ে সব নষ্ট করে দিলে।" তাছাড়া ঠাকুরও চলে গেলেন। এই বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। ফণীবাবু তখন বললেন, "তুমি কাঁদছ কেন? ঠাকুর কৃপা করে স্বয়ং এসে তোমাকে নাম দিয়েছেন এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি হতে পারে? কি নাম দিয়েছেন বল, আমি কাগজে লিখে রাখি। নতুবা ভুলে যেতে পার।" ফণীবাবুর স্ত্রী নাম বললে তিনি তা কাগজে লিখে রাখেন আর মনেমনে ঠিক করেন এই নাম দিয়েই তিনি ঠাকুরকে পরীক্ষা করবেন। এর বেশ কিছুদিন পর একদিন ঠাকুর ফণীবাবুর বাড়িতে

আসলে তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করে দরজার খিল এঁটে দিলেন। ফণীবাবুর স্ত্রী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে প্রণামপূর্বক হাত জোড় করে বললেন, "আমি নাম চাই"। ঠাকুর তখন নাম উচ্চারণ করতে শুরু করলেন। ফণীবাবুর স্ত্রীও একই সাথে নাম উচ্চারণ করলেন। ফণীবাবু কাগজে পূর্বলিখিত নামের সাথে মিলিয়ে দেখলেন একই নাম। নাম দেয়া শেষ করে ঠাকুর ফণীবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই নাম উনি স্বপ্নে পেয়েছিলেন। নাম দেবার পর উপদেশ দেওয়ার সময় আপনি উনার ঘুম ভেঙ্গে দেন, উনি খুব কান্নাকাটি করেছিলেন কি? আমাকেও পরীক্ষা করে নেওয়া ভাল। তাহলে আর সংশয় থাকে না। সংশয়ের নিরসন হওয়া ভাল। গুরুর উপর সংশয় থাকলে ইহকাল পরকাল দুইই যায়। শুনেন, গুরুদর্শন সর্বকালে, সর্ব অবস্থায় সত্য। অতীন্দ্রিয় অবস্থা না হলে ভগবদ্দর্শন লাভ হয় না। গাঢ় ঘুম হলে কে থাকে? তখন যিনি থাকেন তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, তিনি প্রাণ, তিনি ভগবান, তিনিই গুরু। অতএব গুরু দর্শন শয়নে, স্বপনে, জনমে, মরণে সর্ব অবস্থায় মহাসত্য। এতে সংশয় রাখবেন না। এই বলে ঠাকুর নীরব হলেন।

ঠাকুর ছিলেন আড়ম্বরহীন সাধারণ মানুষের মত। বাহ্যিক আবরণের কোন বালাই ছিল না। যতদিন সুস্থ দেহে ছিলেন শুধু একটি ধূতি ও একটি চাদর তাঁর পরিধেয় ছিল। শীত কিংবা গ্রীষ্মে তিনি সবসময় একই পোশাকে থাকতেন। জীবনের শেষ ভাগে আশ্রিতরা তাঁকে গরম জামাকাপড় প্রভৃতিতে ভূষিত করতেন। ওগুলো তিনি ইচ্ছামত দান করে দিতেন। পুঁথিগত বিদ্যা তাঁর অবিদিত ছিল বলা চলে। কিন্তু তিনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন। মহান আত্মার ভাবাবেশে তিনি কথা বলতেন। তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সবার মাথা আপনা হতেই অবনত হয়ে যেত। অত্যন্ত সুমধুর সঙ্গীতের মত ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। ভাবোচ্ছ্বাসগুলি ছিল স্বর্গের দৃশ্যের মত। সে স্বর্গে সব ছিল মানব প্রেমে সম্মিলিত। পাপী, অজ্ঞ, মূর্খ, সমাজের পরিত্যক্ত যত আবর্জনা সবাইকে তিনি কোলে টেনে নিতেন। যা তিনি স্পর্শ করেছেন তাই পবিত্র হয়ে যেত। এমন কোন মলিনতা ছিল না যা সেই পুণ্যের আলোকে কোন কলঙ্কের রেখাপাত করতে পারে। সুগভীর জ্ঞান ও পবিত্রতা ছিল তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই স্বাভাবিক। আপন-পর বলতে তাঁর কাছে কিছুই ছিল না। সবাই তাঁর কাছে ছিল সমান; সর্বাধিক প্রিয় তাঁর কেউই ছিল না, তাঁর কাছে যিনিই যেতেন, তিনিই নিজেকে মনে করতেন ঠাকুরের অতি প্রিয় জন।

শিশু কিংবা যুবক-যুবতী, বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবাইকে তিনি 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। এমনকি বাড়ির ঝি-চাকর, রাস্তার কুলি-মজুর, যাদের আমরা সাধারণত তাচ্ছিল্যভরে 'তুমি' বা 'তুই' বলে সম্বোধন করি, তাদেরও ঠাকুর 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন আর স-সম্মানে নিজের কাছে এনে বসাতেন। সকল জাতি ধর্মের মধ্যে তিনি সত্যকে দেখতেন। যা কিছু মঙ্গল, যা কিছু সুন্দর সবই ছিল তাঁর মধ্যে বর্তমান। প্রীতি, ভক্তি, ত্যাগ ও সেবায় তাঁর সমগ্র জীবন ছিল নিবেদিত। যেখানে তিনি উপস্থিত হতেন, সেখানেই সকল দুঃখ ও অনুযোগ স্তব্ধ হয়ে যেত। তিনি স্নান করতেন না। কেবল মজঃফরপুরে থাকাকালীন তিনদিন ঠাকুরের সমস্ত শরীরে দই মেখে চান করানো হয়েছিল। পুরীতে সমস্ত দিন সমুদ্র সৈকতে বালির মধ্যে বসে থাকার কারণে যখন সর্বশরীরে তাঁর বালি ও কাদা লেগে যেত, সে সময় ২২ দিন ধরে প্রতিদিনই ঠাকুরকে স্নান করান হত। কেউ জোর করে তাঁর পরিধেয় জামা-কাপড় পরিবর্তন না করে দিলে তিনি ঐভাবেই থাকতেন। যেখানেই তিনি যেতেন, তাঁর ভক্তরাই পরিধেয় কাপড়গুলো পরিষ্কার করে দিতেন। কোনদিন তাঁকে ভাত খেতে দেখা যায়নি। বরাবরই সামান্য ফল-মূল, দই, দুধ, সন্দেশ আর লুচি-তরকারি ভোগে লাগত; মানকচু, ওলকচু, কাঁচাকলা, বিচিকলা, ঢ্যাঁড়স, মর্তমান কলা ও চালতার আচারও কখনো কখনো তিনি পছন্দ করতেন। তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, দর্শন, জ্যোতিষ গণনা, ডাক্তারি, কবিরাজি প্রভৃতি সব শাস্ত্রেই তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল। ভারতের প্রচলিত সব ভাষাগুলোই তিনি জানতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখনিঃসৃত গীতার ব্যাখ্যা বাজারে প্রকাশিত কোন ভাষ্যে পাওয়া যায় না। যারাই সৌভাগ্যক্রমে তাঁর শ্রীমুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনেছেন তারা সবাই মুগ্ধ হয়ে বলেছেন, এমন ব্যাখ্যা পূর্বে কখনো তাঁরা শোনেন নি।

তাঁর কাছে কোন জাতিভেদও ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সবাইকে তিনি বলতেন মানবজাতি। সবাইকে তাই তিনি কোল দিয়েছিলেন। হিন্দু মন্দির, মুসলমান মসজিদ, খ্রিষ্টানদের গির্জা সবগুলোকে তিনি এক উপাসনালয় হিসেবে দেখতেন। ঠাকুর স্বয়ং মক্কা-মদিনা মুসলমান-তীর্থক্ষেত্র দর্শন করেছিলেন। তিনি বলতেন, সব ধর্মই এক ভগবানকে নির্দেশ করে। সুতরাং ভগবানের আরাধনায় আবার ভেদাভেদ কেন? তাই যেকোন ধর্ম উৎসবে সব জাতিই যোগদান করতে পারেন। যারা তাঁর কাছ থেকে নাম পেয়ে বা দীক্ষা গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন সবাইকে ঠাকুর বলেছেন, "এই নাম জীবনের একমাত্র সম্বল।" পূজা-অর্চনা, ভোগ নিবেদন যা কিছু করবেন, ঐ এক নাম স্মরণ করেই করবেন। সবসময় নাম জপ করলে অন্তিমে অবশ্যই কৈবল্য-প্রাপ্তি হবে।

ঋণ:

১। রাম ঠাকুরের কথা – ড. ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর এস
২। শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব – শ্রীশুভময় দত্ত
৩। সাধু দর্শন ও সৎসঙ্গ – ড. গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ
৪। শ্রীশ্রীরামঠাকুর – শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা
৫। শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্র – শ্রীমাধবচন্দ্র মজুমদার
৬। ছন্নাবতার শ্রীশ্রীরামঠাকুর – শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী
৭। শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম আশ্রয়, চট্টগ্রাম। ❑

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥
[অ : ৩, শ্লোক : ৪১]

অনুবাদ ঃ অতএব ভারত শ্রেষ্ঠ! তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রিক করে এই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশকারী মহাপাপী কামকে বিনাশ করো।
[অ : ৩, শ্লোক : ৪১]

গুরুর মুক্তিদাতা লোকনাথ ব্রহ্মচারী

শাশ্বতী সিংহ

'কৃষ্ণ রুষ্ট হলে গুরু, রুখিবারে পারে/ গুরু রুষ্ট হলে কৃষ্ণ রুখিবারে নারে।' ভারতীয় অধ্যাত্মবাদে গুরুর গুরুত্ব এমনই প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছে। আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় গুরু জন্মদাতা পিতামাতা। বাবা-মাকে মান্য করা, তাঁদের নির্দেশ, উপদেশ পালন করা গুরুভক্তির প্রথম সোপান। তারপর আসেন শিক্ষা গুরু, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বা সাধারণ পেশায় যাঁরা আসেন তাঁদের শিক্ষকরাই বাস্তব জীবনে শিক্ষাগুরু। এরপর আসেন আধ্যাত্মিক গুরু। যিনি দীক্ষা বা বীজ মন্ত্র দিয়ে ধ্যান ও জপের মাধ্যমে নিজের ইষ্টদর্শন ও আত্মদর্শনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। শাস্ত্রে বলে যাঁর আত্মদর্শন হয়নি তাঁর গুরুগিরি করার অধিকার নেই। আমি নিজেই যদি পথটা না চিনি, তবে অন্যকে সেই পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব কী করে।

যিনি দীক্ষা বা বীজ মন্ত্র দিয়ে ধ্যান ও জপের মাধ্যমে নিজের ইষ্টদর্শন ও আত্মদর্শনের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। শাস্ত্রে বলে যাঁর আত্মদর্শন হয়নি তাঁর গুরুগিরি করার অধিকার নেই। আমি নিজেই যদি পথটা না চিনি, তবে অন্যকে সেই পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করব কী করে।

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ, যিনি বারদীর ব্রহ্মচারী নামেই সেই সময় সমধিক পরিচিত ছিলেন তাঁর আবির্ভাব বাংলার ১১৩৭ সাল, ইংরেজি ১৭৩১ খ্রিষ্টাব্দ। তিরোধান বাংলার ১২৯৭ সাল, ইংরেজির ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে।

তাঁর জীবনে গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলির প্রভাব ও শিষ্যের আধ্যাত্মিক উত্তরণের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কাহিনী আজ ইতিহাস। বারাসত মহকুমার দেগঙ্গা থানার অন্তর্গত চাকলা গ্রামে বাস করতেন রামনারায়ণ ঘোষাল ও তাঁর পত্নী কমলা দেবী। তাঁদেরই চতুর্থ সন্তান লোকনাথ। ধর্মনিষ্ঠ ঘোষাল পরিবারের রামনারায়ণের ইচ্ছা ছিল তাঁর বংশে একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হয়। সেকালে লোকের বিশ্বাস ছিল যে, কোনও ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নের পর বাড়ি ফিরে না এসে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীব্রত গ্রহণ করে যদি গৃহত্যাগ করেন তাহলে ওই বংশের উদ্ধার হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার মুক্তির জন্য পিণ্ডিদানের আর প্রয়োজন হয় না।

'সন্ন্যাস ব্রত শুধু ব্যক্তিগত মুক্তি সাধনার ব্রত নয়। এ ব্রতের উদ্দেশ্য জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন।' (এই তথ্য দিয়েছেন বিশিষ্ট সাধক ও সংগীতশিল্পী এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিলীপ রায়।) প্রথম তিনটি সন্তানের জন্মের পর কমলাদেবী স্বামীর ইচ্ছা পূরণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিতে পারেননি। চতুর্থ সন্তান লোকনাথের জন্মের পর তাঁর মনে হয়েছিল এই শিশু অলৌকিক মহাশক্তি নিয়ে এসেছেন। ইনিই ইহ জগতের হিত সাধন করতে পারবেন।

সেই সময় কচুয়া গ্রামে ভগবান গাঙ্গুলি নামে এক সর্বশাস্ত্র বিশারদ মহাজ্ঞানী পণ্ডিত বাস করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তেলুগু, দ্রাবিড়, কর্ণাট, মিথিলা ও বঙ্গদেশে সুবিদিত ছিল। এক কথায় ভগবান গাঙ্গুলি 'জ্ঞানমার্গাবলম্বী মহাপণ্ডিত' ছিলেন। ঘোষাল পরিবারের পরম হিতকারী লোকনাথের পিতার অনুরোধে শিশুকে দেখে এবং লক্ষণ বিচার করে তাঁর মধ্যে ভবিষ্যৎ মহাপুরুষের চিহ্ন বিদ্যমান বলে জানান। কোষ্ঠিবিচার করে শিশুটির নামকরণ করা হয় শ্রীলোকনাথ ঘোষাল। লোকের নাথ 'লোকনাথ' নামই সম্ভবত মহাশিশুর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্দেশ করেছিল।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথকে গুরুজনরা নানা রকম চিত্তাকর্ষক আখ্যান ও উপদেশ দিতেন, সেইসঙ্গে যতটুকু সম্ভব লেখাপড়া চর্চা করা সম্ভবপর তাও করানো হয়। তবে স্বাভাবিক বালকের মতো শিশুসুলভ চপলতা তাঁর ছিল। শিশুকালে লোকনাথের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। উপনয়নের পর লোকনাথ সন্ন্যাস নেবেন জেনে বেণীমাধবও তাঁর সঙ্গে সন্ন্যাস নেবেন বলে জেদ ধরে বসেন। এগারো বছর বয়সে দুই বালকের একই সঙ্গে উপনয়ন হয়। মহাপণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ওই দুই বালককে নিয়ে তিনিও সন্ন্যাস নিয়ে গৃহত্যাগ করবেন। শিষ্যদের আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুর এই আত্মত্যাগ বোধহয় আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতেই সম্ভব। কিন্তু বেণীমাধবের পরিবারের লোকজন ও অভিভাবকরা তাঁকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি দিতে চাননি। কিন্তু শিশু বেণীমাধবের সংকল্পের কাছে তাঁরা হার মানেন। ভগবান গাঙ্গুলির বয়স তখন ষাট বছর। সকালবেলা সদ্য ব্রহ্মচর্য পালনের ও উপনয়নের পর পরনে চেলি, মুণ্ডিত মস্তক, চন্দনচর্চিত, পুষ্পমাল্য শোভিত, দুই বালক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে সংসারের ভার জ্যেষ্ঠপুত্রের উপর অর্পণ করে ভগবান গাঙ্গুলি বনবাসী হওয়ার জন্য বিদায় নিলেন। সেই দৃশ্য যে কী হৃদয় বিদারক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

লোকনাথ ও বেণীমাধবকে সামনে রেখে পিছনে গুরু ভগবান গাঙ্গুলি যাত্রা শুরু করেন। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিও বোধহয় সেই করুণ দৃশ্যকে অতিক্রম করতে পারেনি। সেই সময় লোকনাথের মাতা কমলাদেবী বা বেণীমাধবের মাতার অবস্থার কোনও বর্ণনা লিপিবদ্ধ না থাকলেও অনুমান করতে কারও কষ্ট হবে না। গ্রামবাসীরা গ্রামের শেষ সীমা পর্যন্ত সশিষ্য গাঙ্গুলি মহাশয়কে অনুসরণ করেছিলেন। পদব্রজে তাঁরা কালীঘাট পৌঁছে কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। এখানেই শিশু দু'টির 'নক্তব্রত' আরম্ভ হয়। গুরুনির্দিষ্ট জপতপে সারাদিন কাটিয়ে রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন। লোকনাথ ও বেণীমাধবকে ধ্যান জপে বসিয়ে গুরু ভগবান গাঙ্গুলি নগরে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। ফিরে এসে নিজ হাতে ভিক্ষালব্ধ তিলদুগ্ধ দিয়ে হবিষ্য রান্না করে দেবতাকে নিবেদন করে, ওই দুই শিষ্যকে আহার করিয়ে, নিজে আহার করতেন। সেই সময় লোকনাথের বাড়ি থেকে বালকের খরচ বাবদ কিছু টাকা আসত।

ব্রহ্মচর্যের এই অবস্থায় যোগসাধন ও আহার বিষয়ে নিয়ম পালন অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। দেহরক্ষার জন্য আহার অনুষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে ব্রতগুলির নাম যথাক্রমে নক্তব্রত, দিনে উপবাস, রাত্রিতে আহার। এরপর একান্তরা। পূর্ণ একদিন উপোস থাকার পর, পরের দিন একবার আহার গ্রহণ। এরপর ত্রিরাত্রি, তিন দিন উপবাস থাকার পর চতুর্থ দিনে আহার গ্রহণ। এইভাবে পঞ্চাহ, পাঁচদিন উপবাস থাকার পর আহার গ্রহণ। নবরাত্র, দ্বাদশাহ, পক্ষাহ, সর্বশেষ মাসাহ এক মাস উপবাস। এইসব ব্রতানুষ্ঠানের সময় উপবাসকালে গুরুনির্দিষ্ট যোগাভ্যাসে অতিবাহিত করতে হয়। এই আট প্রকারের ব্রত পালনের নিয়ম হল,

একটি ব্রত পালনে সক্ষম হলে তবে পরেরটি করতে পারবেন। লোকনাথ ও বেণীমাধবের এই ব্রত উত্তীর্ণ হতে প্রায় চল্লিশ বছর কেটে যায়। ফলে সেই সময় তাঁদের বয়স পঞ্চাশ বছর আর গুরু ভগবান গাঙ্গুলির বয়স তখন একশো বছর।

দ্বিতীয় বার এই ব্রত পালনের পর লোকনাথের লৌকিক জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তিনি যোগবলে পূর্ব জন্মের পূর্ণ স্মৃতি ফিরে পান। অর্থাৎ তাঁর জাতিস্মরতা প্রাপ্তি হয়। পূর্বজন্মে তিনি যে সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সাধক ছিলেন এবং বর্ধমান জেলার দামোদর নদের ধারে বেরুগ্রামে তাঁদের বাস ছিল। তাঁরা চার ভাই ছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ এবং অকৃতদার। এইসব কথা স্মরণে এলো এবং তাঁর মানসপটে সিনেমার রিলের মতো গ্রামের বাড়ি, মাঠঘাট, আত্মীয় পরিজনের কথা ভেসে উঠল।

নক্তব্রত উদযাপনের পর তাঁরা দীর্ঘদিন অতিক্রম করে বেরুগ্রামে এসে পৌছান। দামোদর নদের কাছে এসে গুরু ভগবান লোকনাথকে প্রশ্ন করেন, এই নদ তিনি কখনও দেখেছেন কি? সেখানে পৌছে লোকনাথের পূর্বস্মৃতি আবার ফিরে এলো। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে সীতানাথ সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। তিনজন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়ে গ্রামবাসীরাও ধন্য হন। সেখান থেকে তাঁরা হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে দামোদর নদ সংলগ্ন এক বনভূমিতে তাঁরা কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানে এক কালীসিদ্ধার সঙ্গে লোকনাথের দেখা হয়।

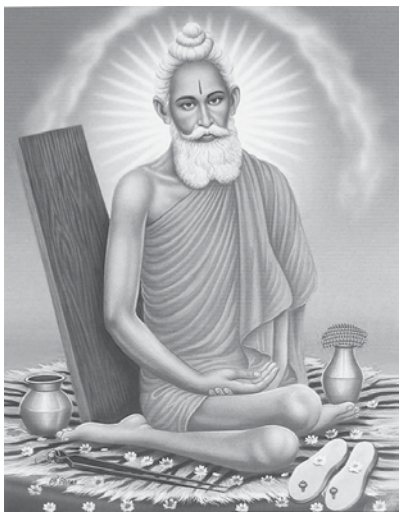

হিমালয়ে গিয়ে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করবেন কিনা জানতে তিনি চারবার প্রশ্ন করেন, কিন্তু কোনও উত্তর আসেনি। তখন কালীসিদ্ধা নিজে প্রশ্ন করেন এবং দৈববাণী হয়, 'হ্যাঁ, হিমালয়ে সিদ্ধিলাভ ঘটিবে।' বর্ধমান থেকে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ভারতের উত্তর পশ্চিম গিরিপথে তাঁরা হিমালয়ে প্রবেশ করেন। হিমালয় যাত্রাপথে দু'জন মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। লোকনাথ তাঁদের 'বড় ঠাকুর' ও 'ছোট ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁরা লোকনাথদের বরফাকীর্ণ পথ ধরে তপস্যাযোগ্য স্থানে পৌছে দেন। বিদায় কালে বলে যান, 'এই বরফের দেশে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে তোমাদের শরীরে রক্তকণিকা থাকিবে না'। পঞ্চাশ বছর সাধনার পর অষ্টাঙ্গ যোগের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে 'সমাধি' অবস্থায় লোকনাথ নিজ আত্মায় 'ব্রহ্মদর্শন' করেন। তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। 'ব্রহ্মদর্শন' ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ পূর্ণানন্দ অবস্থা। এই অবস্থায় জীবাত্মা অনন্ত আনন্দ সাগরে ডুবে থাকেন।

সমাধি ভঙ্গের পর যোগী লোকনাথ অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না। বললেন, 'গুরু তোমারই অসীম কৃপায় আমি পার হলাম, আর তুমি যেমন ছিলে তেমনই রয়ে গেলে। তোমার এই অবস্থা দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তোমার যে কবে মুক্তিলাভ হবে তা ভেবে আমি বড়ই আকুল হচ্ছি।' গুরু ভগবান বলেন, লোকনাথ আমি চিরদিনই জ্ঞানযোগাবলম্বী। কর্মযোগে যে এমন সিদ্ধিলাভ হতে পারে এমন বিশ্বাস আমার ছিল না। এখন আমি এই শিক্ষা লাভ করলাম যে, 'নিষ্কাম কর্মসাধনই জীবের মুক্তিলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা'। ব্রহ্মচারী লোকনাথ গুরুকৃপায় মুক্ত হয়েছেন। আর গুরু এখনও রয়ে গেলেন। এই কষ্ট লোকনাথের মনঃপীড়ার কারণ হল।

গুরু ভগবান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, অতি শীঘ্র তিনি দেহপাত করবেন। এবং পুনরায় জন্ম নিয়ে লোকনাথের শিষ্য হবেন। তখন 'তুমি হইবে আমার গুরু এবং তুমি আমাকে তোমার পথে চালাইয়া লইবে।' লোকনাথ ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন 'গুরু এত কঠিন কাজের দায়িত্ব তুমি আমাকে দিও না। তুমি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করবে এবং আমার শিষ্য হবে। আমি কীভাবে তোমার সংস্কার পরিবর্তন করে তোমাকে কর্মপথে প্রবৃত্ত করাব।' শিষ্য লোকনাথকে আশ্বস্ত করে গুরু ভগবান বলেছিলেন, 'লোকনাথ এ বিষয়ে তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি নিজেই এই ভার গ্রহণ করিব।' দেড়শত বছরের গুরুর কাছে একশত বছরের শিষ্য বালকমাত্র। কী মধুর গুরুস্নেহ। আর কি একনিষ্ঠ গুরুভক্তি। পরবর্তী জীবনে, হিমালয়ে সাধনা শেষে কাবুল হয়ে তাঁরা কাশীধামে আসেন। সেখানে হিতলাল মিশ্র নামে এক সাধকের হাতে দুই শিষ্যের ভার অর্পণ করেন। এই হিতলাল মিশ্রই কাশীধামের চলন্ত শিবঠাকুর 'ত্রৈলঙ্গ স্বামী'। এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটে গঙ্গাস্নান শেষে জপে বসেন গুরু ভগবান গাঙ্গুলি। সেখানেই দেহরক্ষা করেন। লোকনাথের নেতৃত্বে বেণীমাধব পশ্চিমাঞ্চল অভিমুখে রওনা হন। আফগানিস্তান ও পারস্যদেশ অতিক্রম করে তাঁরা আরব দেশে পৌছান। হযরত মহম্মদ এর জন্মস্থান মক্কা আর তাঁর ইহলীলা সংবরণের স্থান মদিনা নগরী দর্শন করেন। মহাপুরুষ লোকনাথ জাতি বিচারের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

বিশিষ্ট মুসলমানরা তাঁদের আহারের বন্দোবস্ত করেন। মদিনায় এসে তিনি 'মক্কেশ্বর' এর কথা শোনেন এবং তাঁকে দেখার জন্য তিনমাসের মরুপথ অতিক্রম করে সেখানে পৌছান। যাওয়ার পথে আব্দুল গফুর নামে এক মহাপুরুষের নাম শুনে তাঁকে দর্শন করেন। পরবর্তী জীবনে লোকনাথ বলেছিলেন তিনি মক্কায় আবদুল গফুর নামে এক ব্রাহ্মণকে দর্শন করেছিলেন। 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছিলেন, 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রাহ্মণ'। আবদুল গফুরের কাছে বিদায় নিয়ে ইউরোপ অভিমুখে রওনা হন। তাঁর কাছে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকলেই সমান ছিলেন। আরবদেশ, ইউরোপ, চীন, সুমেরু শৃঙ্গ অভিযান শেষ করে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে আসেন তাঁরা। সেখানেই বেণীমাধবকে বিদায় দিয়ে ত্রিপুরা জেলার দাউদকান্দিতে আসেন লোকনাথ। এখন থেকে তাঁদের দু'জনের কর্মপথ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। সেখানে ডেঙ্গু কর্মকার নামে এক ব্যক্তি এক মামলায় বিপর্যস্ত হয়ে লোকনাথ বাবার শরণাপন্ন হন। তাঁর কৃপায় মামলা জয়ের পর ডেঙ্গু তাঁকে ঢাকার বারদীতে গিয়ে তাঁর বাড়িতে থাকার প্রস্তাব দেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী লোকহিতার্থে বারদীতে এসে বাস শুরু করেন। পরবর্তীকালে তিনি সেখানেই আশ্রম করেন এবং তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা লোকমুখে প্রচারিত হয়। তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী নামেই খ্যাতি লাভ করেন। সেখানেই গুরু ভগবান গাঙ্গুলি পরজন্মে তাঁর শিষ্য, লোকনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে কর্মযোগে সিদ্ধিলাভ করেন। যেমন গুরু, তেমনই শিষ্য। এই হল অধ্যাত্মভূমি ভারতের গুরুশিষ্য পরম্পরার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লোকনাথ ব্রহ্মচারী একশত ষাট বছর জীবিত ছিলেন। বারদীতে অবস্থানের সময় তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও ভক্তদের প্রতি অহেতুক কৃপার অজস্র ঘটনা লোকমুখে বহুল প্রচারিত। দেহরক্ষার আটদিন আগে লোকনাথ ব্রহ্মচারী শিষ্যদের তাঁর দেহত্যাগের কথা জানিয়ে দেন। এই

সময় একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে। বাংলার ১২৯৭ সালের ১৮ জ্যৈষ্ঠ শনিবার সন্ধ্যার পর এক সৌম্যমূর্তি সন্ন্যাসী বারদীর বিখ্যাত পুরোহিত বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। ইনিই লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের অতিপ্রিয় শিষ্য পরিব্রাজক রামকুমার চক্রবর্তী। পরদিন ভোরবেলা বারদী নিবাসী বৃদ্ধ চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে আসেন এবং সরাসরি তাঁর ঘরে যান। কিছুটা সময় নিভৃতে গুরুদেবের সঙ্গে কাটান। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যকে ভিতরে ডেকে ওইদিনই যে তিনি দেহরক্ষা করবেন সেকথা জানিয়ে দেন। তাঁর পরিত্যক্ত দেহ শিষ্য রামকুমার দাহ করবে এবং সেই মুখাগ্নি করবে বলেও তিনি জানিয়ে দেন। আশ্রমের সকলকে সকাল ৯টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে নিতে নির্দেশ দেন।

আশ্রমে শোকের ছায়া নেমে আসে। উত্তরায়ণের শুক্লপক্ষ, ১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, বেলা ১১ টা ৪০ মিনিটে লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ মহাযোগাসনে উপবেশন করলেন। সকলেই বুঝলেন এই তাঁর শেষ আসন গ্রহণ। শিষ্য রামকুমার চক্রবর্তীর অনুমতি নিয়ে শ্রীদেহ স্পর্শ করে বেলা ১১টা ৫৫ মিনিটে জানা যায় তিনি চিরদিনের জন্য লৌকিক দেহখানি ছেড়ে উজ্জ্বল সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে ব্রহ্মলোকে চলে গিয়েছেন। তখন পবিত্র যোগদেহখানি ঘর থেকে বাইরে এনে বেলগাছের তলায় রাখা হয়। আশ্রমের দক্ষিণাংশে কিছুটা পূর্বকোণে চন্দন কাঠে তাঁর অন্তিম শয্যা রচিত হয়। রামকুমার শাস্ত্রমতো দেহখানির শিরঃস্থলে সর্বপ্রথম অগ্নি সংযোগ করেন।

'সুদীর্ঘ ইতিহাসপূর্ণ একশত ষাট বছরের লৌকিক দেহখানি ক্রমশ অগ্নি গ্রাস করিল।' অতি অল্প সময়ের মধ্যে ওই পবিত্র দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল। গুরু লোকনাথের দেহরক্ষার পর রামকুমার চক্রবর্তী চার-পাঁচদিন ওই আশ্রমে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি ফলমূল আহার করতেন এবং হাতের ওপর মাথা রেখে মাটিতে শয়ন করতেন। এরপর তিনি কাশীধামে যান এবং অল্পদিন পরে সেখানে মণিকর্ণিকা ঘাটে যোগাসনে দেহত্যাগ করেন।

সমস্ত ঘটনা পরম্পরা বিচার করে সেই সময়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের অনেকেরই বিশ্বাস ছিল ইনিই পূর্বজন্মে ভগবান গাঙ্গুলি ছিলেন। সেই সময় তাঁর দেহত্যাগের পর লোকনাথ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন। এই জন্মে ভগবান গাঙ্গুলি লোকনাথের শিষ্য হয়ে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে তাঁর কথা রাখলেন। ❑

কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥
[অ : ২, শ্লোক : ৫১]

অনুবাদ ঃ নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষীগণ কর্মজাত ফল ত্যাগ করিয়া জন্মরূপ বন্ধন হইতে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রবরহিত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।
[অ : ২, শ্লোক : ৫১]

সবার হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী অলোকেশানন্দ

১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ ফেব্রুয়ারি (৬ ফাল্গুন, বুধবার) শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে কলকাতা থেকে প্রায় ২৮০ কি.মি দূরে প্রত্যন্ত পল্লিগ্রাম কামারপুকুরে এক দরিদ্র, ধার্মিক, ব্রাহ্মণ পরিবারের মাতা চন্দ্রমণি দেবী ও পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে এক অপূর্ব সুন্দর শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রসূতির ঘরে ওই শিশুপুত্রকে দেখতে না পেয়ে ধনী কামারনী খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে ওই ঘরের ধান সেদ্ধ করার চুল্লির ভেতর থেকে ছাই মাখা অবস্থায় পাওয়া গেল। সেখান থেকে তুলে এনে চন্দ্রমণিদেবীর কোলে দিতেই মাতার মন জয় করে নিলেন ছোট শিশুটি। নাম, গদাধর চট্টোপাধ্যায় ওরফে গদাই। পরবর্তীকালে সেই শিশুই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব। জন্মাবার পর থেকেই তার চিত্তাকর্ষক শক্তি দিন দিন শুধুমাত্র মাতা-পিতাকে নয়, পরিবারের সকল নরনারী, বিশেষ করে পল্লিরমণীদের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাঁদের হৃদয় জয় করে নিল। এরপর ওই দরিদ্র কুটিরে বিভিন্ন অছিলায় পল্লিবাসীগণ আসতে লাগলেন শিশুপুত্রটিকে একবার দেখার জন্য। সকলে আসতেন, দেখতেন এবং অপূর্ব আনন্দ ও তৃপ্ত হৃদয়ে ফিরে যেতেন।

এরপর গদাই যখন পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করলেন, তখন বন্ধুদের সঙ্গে রামলীলা যাত্রাপালার গান ও অভিনয় মুখস্থ করে, অনুকরণ করে দেখিয়ে বন্ধুদের মনও জয় করে নিয়ে বিভিন্ন রঙ্গরসে মেতে উঠতেন। সদানন্দ বালক গদাইয়ের রঙ্গ-রসপ্রিয়তা, তার অদ্ভুত অনুকরণ শক্তি ও উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে আশেপাশের গ্রামবাসীদের কুম্ভকার, শাঁখারি ও পাট ব্যবসায়ীগণের মন জয় করে সবার হৃদয়ে স্থান করে নিল। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে তাঁর আচার-আচরণ এমন হত যে, দু-একদিন দেখা না হলে তাঁর খোঁজ নিতেন। সুযোগ খুঁজতেন কীভাবে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। এই প্রভাব থেকে পাশাপাশি জমিদার পরিবারও বাদ যায়নি। কামারপুকুরের জমিদার লাহাবাবু, দুর্গাদাস ছাড়া এক মাইল উত্তরে ভুরোসুবো গ্রামের জমিদারের মনও জয় করে ফেলেছিলেন প্রথম সাক্ষাতে। মানিক রাজা গদাইয়ের পিতাকে খুব পছন্দ করতেন তাঁর সহজ জীবনযাপন, সততা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য। তখন তাঁর ছয় বছর বয়স। পিতার সঙ্গে মানিক রাজার বাড়িতে গেলেন। মধুর বালকসুলভ ব্যবহারে চিরপরিচিতের ন্যায় এবং নিঃসঙ্কোচে ওই পরিবারের সকলে ওইদিন থেকেই তাঁর প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁকে দেখে মানিক রাজার ভ্রাতা বললেন– "…. তাঁকে দেখলে পরম আনন্দ হয়।"

> মৃন্ময় মূর্তিকে চিন্ময় রূপে দেখার পরই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু রূপে হৃদয়ে বসালেন। এই যুবকটি ছিলেন কলকাতার সিমলা পল্লির নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ।

এরপর রাজার অনুরোধে মাঝে মাঝে তাঁকে জমিদার বাড়িতে নিয়ে যেতে হত। অনেকদিন না গেলে ওই বাড়ির কোনও মহিলাকে পাঠিয়ে গদাইকে সকালে নিয়ে গিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি দিয়ে যেতেন। এছাড়া পল্লিবাসীরা বাড়িতে কোনওরূপ ভালো খাবার করলে গদাইকে খাওয়াতেন। অনেকে আবার গদাইকে খাওয়ানোর জন্য তাঁর সমবয়স্ক বালক-বালিকাদেরও খাওয়াতেন।

পিতার মৃত্যুর পর অভাবী সংসারে অর্থ উপার্জনের আশায় দাদা রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় এলেন। কিন্তু তখন কি কেউ জানতেন যে রানি রাসমণির আরাধ্য দেবী, মৃন্ময়ী মূর্তি মা ভবতারিণীকে চিন্ময়ী রূপে প্রতিষ্ঠা করে জগতে দৃষ্টান্ত রাখবেন? লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর পুণ্য ও পবিত্র ভূমি হবে? জন্মভূমি কামারপুকুর তীর্থস্থান হবে? গদাধর সকলের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে পূজা পাবেন? কেমনভাবে যেন তাঁর সুন্দর ব্যবহার, সহজ-সরল কথা কলকাতাবাসী বিদ্বজ্জনদের মধ্যে স্থান পেয়ে গেল! বেদ-উপনিষদের কঠিন কঠিন সংস্কৃত ভাষা এমন সহজভাবে বললেন যে শুধু আজকে নয়, ভবিষ্যতেও সকল সাধারণ মানুষ বুঝতে পারবেন। যে ভাষা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করবে। যে কথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তব। সেই কথাগুলি একত্র করে শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছদ্মনাম 'শ্রীম' নাম দিয়ে 'কথামৃত' বই প্রকাশ করলেন। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কথা প্রচার করতেই বিভিন্ন ধর্মের লোক নানারকম প্রশ্ন করতেন, তাঁর সহজ সরল উত্তর পেয়ে তৃপ্ত হয়ে ফিরে যেতেন।

আমার মতো সমাজে এক ধরনের সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মানুষ থাকেন। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাঁরা সহজে কিছু মেনে নেন না, সবকিছু হেসে উড়িয়ে দেন, যে কোনও বিষয়ে কার্য-কারণ না বুঝে বুদ্ধি ও যুক্তি খোঁজেন। সেইরূপ দক্ষিণেশ্বরেও আমাদের পক্ষ থেকে এক যুবক উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁকে কিছু প্রশ্ন করে বিপাকে ফেলতে। যিনি কিনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পাগলা বামুন বলে জানতেন। তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। ধাতব বস্তু ও টাকা-পয়সা ছুঁতে পারতেন না জেনে, বিছানায় মাদুরের তলায় মুদ্রা রেখে পরীক্ষাও করেছিলেন। তারপর মৃন্ময় মূর্তিকে চিন্ময় রূপে দেখার পরই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু রূপে হৃদয়ে বসালেন। এই যুবকটি ছিলেন কলকাতার সিমলা পল্লির নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবও পরীক্ষা করে দেখছিলেন, যুবক নরেন্দ্রনাথের মন সত্য-সত্যই জয় করতে পেরেছেন কিনা। তাই তিনি কিছুদিন সম্ভবত তিন মাস নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলেননি। তাঁকে দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নিতেন। তাকাতেনও না। তৎসত্ত্বেও নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে আসতেন, বসতেন, কথা শুনতেন, চলে যেতেন। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করলেন - "তুই এখানে আসিস কেন?" উত্তরে নরেন্দ্রনাথ বললেন- "আপনাকে ভালো লাগে, তাই আপনার কথা শুনতে আসি।" উপযুক্ত গুরু যোগ্য শিষ্য পেয়ে তাঁর ভাবগুলিকে বিশ্বের দরবারে প্রচার করালেন নরেন্দ্রনাথ ওরফে স্বামী বিবেকানন্দের মাধ্যমে।

জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মন শ্রীরামকৃষ্ণদেব জয় করতে পেরেছিলেন। কারণ বারো বছর বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ অবলম্বনে সাধনার দ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধি করেছিলেন। পূজারি রূপে শুরু করে রানি রাসমণির আরাধ্যা দেবী মা ভবতারিণীকে জাগ্রত করলেন। এরপর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়ে তন্ত্র সাধনা, রামলালার সাধন, বৈষ্ণব মতে সাধন, তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত মতে ও শেষে বাজেত আলি খানের (ওরফে সুফি গোবিন্দ রায়) কাছে ইসলাম ধর্মে সাধনা করে সত্যকে উপলব্ধি করে নতুন ভাব প্রচার করলেন- "যত মত তত পথ।" যা সকলের গ্রহণযোগ্য।

সমাজের সকল ধর্মের মানুষের ধর্মভাবকে নতুন করে হৃদয়ে আকর্ষণ জাগালেন। তার কথামৃত পান করে বহু ধর্মের মানুষ প্রভাবিত হলেন।

মহাত্মা গান্ধীও প্রভাবিত হয়ে বলেছিলেন- "... তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) জীবন থেকে আমরা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দর্শন করি।" জহরলাল নেহরু বলেছিলেন-

"শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে একটি জিনিস দেখা গেছে; যাঁরাই তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরাই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন অদ্ভুতভাবে।"

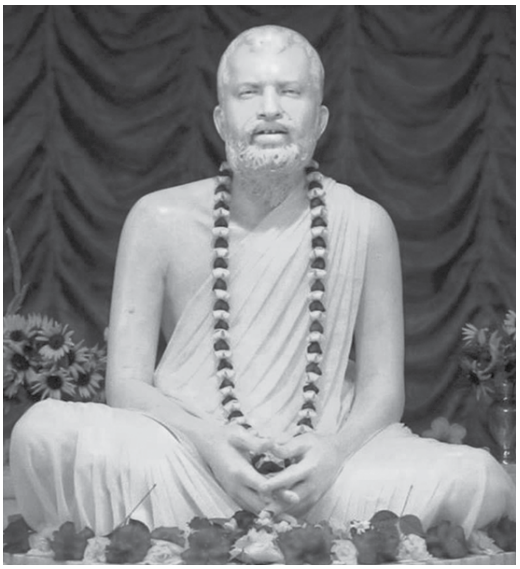

শোকাতুরা বিধবা ব্রাহ্মণী গোলাপ মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে কথামৃত পানে ভগবদভক্তি আস্বাদন করেছিলেন। রামবাবুর চাকর রাখ তু রাম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য হয়ে স্বামী অদ্ভুতানন্দ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এ কথা খুব সত্য, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাব চক্ষে দেখেছেন এবং বলেছিলেন বহু দূর থেকে আমার সব সাদা সাদা ভক্ত আসবে। এসেও ছিলেন। এখনও আসছেন। ভবিষ্যতেও আসতে থাকবেন। কিন্তু তিনি সশরীরে নেই। আছে তাঁর কথামৃত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এবং দেশ-বিদেশের বহু মানুষ আজও কথামৃত পানে প্রভাবিত হচ্ছেন। নিবেদিতা তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামনে দেওয়ালে পৃথিবীর ম্যাপ রেখে তার উপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছবি রেখে বলছেন-"শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতের গুরু, জগৎ তাঁর।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কবিতার মাধ্যমে প্রণতি জানাচ্ছেন। সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন-"রামকৃষ্ণের আবেদনের সার্থকতা ছিল তাঁর জীবনচর্চায় তিনি যেমন উপদেশ দিতেন, নিজে তেমনভাবে চলতেন...।"

লাহোরে জন্ম মহম্মদ দাউদ রাবার বলছেন- "গসপেল অব শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের বন্ধু বলে চিনে নেওয়া যায়।"

পিটার্সবার্গে জন্ম, বিখ্যাত রুশ চিত্রশিল্পী নিকোলাস ডি রোবিক বলছেন- "রামকৃষ্ণ দীপ্র শিক্ষার প্রভাব দেশ-বিদেশে কীরকম ছড়িয়ে পড়ছে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। লজ্জাকর, ঘৃণার উক্তি, অশুভ পারস্পরিক বিনাশ এসবের উর্ধ্বে আছে পরমানন্দের বাণী যা প্রতিটি মনুষ্য হৃদয়ের অতি অন্তরতম বস্তু।"

আমেরিকার জ্যোতির্বিদ, হার্ভার্ড মানমন্দিরের অধ্যাপক ও ডিরেক্টর বলেন- "জগৎ পরিকল্পনায় মানুষের নির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কীয় সমস্যাগুলির সমাধানে যাঁরা কাজ করেন ও চিন্তা করেন শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয় মন তাঁদেরই পরিবেষ্টন করে থাকে।"

আমরা জানি বা না জানি, আমাদের চেতন ও অবচেতন মনে তিনি আছেন। তাঁর দিব্যজীবন সূর্যের আলোকরশ্মির মতো আমাদের চরিত্রে ছড়িয়ে আছে। যাঁরা শান্তি কামনা করেন, যাঁরা সত্যের অনুসন্ধানী তাঁদের হৃদয়ে তিনি চিরকাল আছেন, ছিলেন, থাকবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক রবীন্দ্র অধ্যাপক বলেন- "My eternal friend and the most intimate friend." তাঁর কাছে এলে মানুষ না হেসে পারত না। সকলে ফিরে যেত প্রসন্নতা নিয়ে। গভীর রসের সঙ্গে হাসির রসের মিলন-এ এক rare combination আমরা গুরু বলতে বুঝি, যিনি ২৪ ঘণ্টার গুরু মহাশয়। আর আমার এই ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ২৪ ঘণ্টার আপনজন। ❑

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥
[অ : ৩, শ্লোক : ৯]

অনুবাদ ঃ ঈশ্বরের প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম ব্যতীত অন্য কর্ম বন্ধনের কারণ হয়। অতএব, তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে অনাসক্ত হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত সর্ব কর্ম কর।
[অ : ৩, শ্লোক : ৯]

মাতৃরূপেণ (সংঘ জননী মা সারদা)

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

একশো ষোলো বছর আগের কলকাতা। সে সময়ের সমাজচিত্রটিকে একটু মনে মনে কল্পনা করার চেষ্টা করুন। একদিকে বাবুবিলাস, হাফ আখড়াই, বাঈ নাচ, লাখ টাকা উড়িয়ে বিড়ালের বিয়ে দেওয়ার বিলাস ব্যসন; অন্যদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের নেতৃত্বে বাংলার সংস্কৃতিতে এক নব্য চিন্তা, নব্য চেতনার উন্মেষ। ডিরোজিও-র ইয়ং বেঙ্গলের দাপট তখন কমে এলে, একেবারেই ম্রিয়মাণ হয়ে যায়নি। পাশাপাশি ব্রাহ্ম ধর্মের কিছুটা হলেও প্রসার ঘটিয়েছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জয় করে ফিরে এসেছেন তখন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ধর্মকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে এক উদার-মানবিক হিন্দুত্বের সঙ্গে তখন তিনি পরিচয় ঘটাচ্ছেন সবার। এক অদ্ভুত উন্মাদনা সর্বত্র এই তরুণ সন্ন্যাসীকে ঘিরে। এইরকমই এক সময়ে, ১৮৯৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ লগ্নে লন্ডন থেকে কলকাতা এসে পৌঁছলেন মিস মার্গারেট নোব্‌ল। এই তাঁর প্রথম ভারতে আগমন। ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সমাজজীবন– এ সব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তখন তিনি। গোঁড়া আইরিশ পরিবারের কন্যা মার্গারেট, পরবর্তী কালের নিবেদিতা, তখনও জানেন না, হাজার কুসংস্কার এবং অন্ধ গোঁড়ামিতে আবদ্ধ কলকাতার হিন্দু সমাজ কীভাবে তাঁকে গ্রহণ করবে। তিনি শুধু তাঁর আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে এতদূর ছুটে এসেছেন। এসেছেন বিবেকানন্দের কাজে। আচার্য বিবেকানন্দও তখন জানেন না, তাঁর নিবেদিতাকে কীভাবে গ্রহণ করবে বাংলাদেশের রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ। এইসব না-জানার ঊর্ধ্বে একজন কিন্তু তখন অন্তরালে অপেক্ষা করছিলেন। বাঁকুড়ার অজ গ্রাম জয়রামবাটি থেকে তিনি তখন এসে মাঝে মধ্যেই থাকতেন বাগবাজারের এঁদো গলির ভিতর ছোট্ট একটুখানি বাড়িতে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী, স্বামী বিবেকানন্দের সংঘজননী মা সরদা। মনে রাখবেন, একশো ষোলো বছর আগের কলকাতায় হিন্দু সমাজ তার রক্ষণশীলতার কারণেই কোনও বিদেশিনীকে অন্দরমহলে প্রবেশের অনুমতি দিত না। ঘরে স্থান দেওয়া তো দূরের কথা। স্বামীজির ডাকে সাড়া দিয়ে নিবেদিতা কলকাতায় এসে প্রথমে কিন্তু কোনও হিন্দু গৃহে প্রবেশাধিকার পাননি। কলকাতায় পা রাখার পর প্রথমে চৌরঙ্গি অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্বামীজি তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে বেলুড় মঠের কাছে একটি বাড়িতে নিবেদিতা, সারা বুল ও জোসেফিন ম্যাকলাউডের থাকার ব্যবস্থা করেন স্বামীজি। কিন্তু, সবাই ঘরের আগল বন্ধ রাখলেও এক চিরকালীন জননী তাঁর অন্তরে 'স্নেহের খুকু'র জন্য ভালোবাসার আসন বিছিয়ে অপেক্ষা করছেন, তা কি স্বামীজি জানতেন? হাজার দোলাচলের ভিতর স্বামীজির হয় তো মনে হয়েছিল, বাগবাজারের ওই ছোট্ট বাড়িটিতে অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে।

১৭ই মার্চ, ১৮৯৯ – তারিখটা তাঁর জীবনে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন নিবেদিতা। কেন? কারণ, সেদিন বাগবাজারের গলিতে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছিল। সমাজের হাজার নিষেধ, হাজার সংস্কারকে উপেক্ষা করে, সেদিন সাগরপারের বিদেশিনী কন্যাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন বাগবাজারের মা। ১৭ মার্চ স্বামীজি তাঁর তিন বিদেশিনী শিষ্যাকে সারদাদেবীর সঙ্গে পরিচিত করাতে নিয়ে যান। এই তিনজন হলেন নিবেদিতা, সারা বুল যিনি ধীরা মাতা হিসেবে পরিচিত এবং জোসেফিন ম্যাকলাউড – বিবেকানন্দের প্রিয় বান্ধবী জো। নিবেদিতা তাঁর ডায়েরিতে ওই দিনটি সম্পর্কে লিখেছেন – 'Day of Days'. সারদা দেবীর সঙ্গে এই তিন বিদেশিনীকে সাক্ষাৎ করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিবেকানন্দ এবং তাঁর গুরুভ্রাতাদের মনেও একটি সংশয় ছিল। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না, এই বিদেশিনীদের সারদাদেবী কী উদার মনে গ্রহণ করবেন? নাকি সংস্কারবশত দূরে সরিয়ে রাখবেন? ফলে, বাগবাজারে পৌঁছে স্বামীজি তাঁর গুরুভ্রাতা সারদানন্দের সঙ্গে বাড়ির বাইরে অপেক্ষায় রইলেন। আর তিন বিদেশিনীকে পাঠালেন সারদা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে। নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেঁম লিখেছেন – 'উপরে একখানা মেটে ঘরে, দরজা খোলা। ঢুকেই নিবেদিতার চোখে পড়ল, প্রায় জনা দশেক মহিলা মাটিতে বসে আছেন। ঘরের মাঝখানে সারদা দেবী, তাঁর মুখখানি এখন ঘোমটায় ঢাকা নয়। এঁরা ঢুকতেই শান্ত দৃষ্টিতে যেন স্বাগত জানালেন! ঘরে আর যে মেয়েরা রয়েছেন, প্রায় তাঁদের মুখোমুখি একখানা চেটাই-এর উপর বসে আছেন। পরনে সাদা শাড়ি, তারই আঁচল মাথায় তুলে দেওয়া। লক্ষ্য করলেন পাতলা মকমলের নীচে তাঁর অনাবৃত কাঁধ আর পিঠে ছড়ানো দীর্ঘ কালো কেশের আভাস চোখে পড়ে। খালি-পা দু'খানি আলতায় টুকটুক করছে।... হঠাৎ নিবেদিতা শোনেন মেয়েরা কি যেন ফিসফিস করছে। সবারই চোখে একটা কৌতূহল। ব্যাপার কী? এবার এক মহিলা এঁদের তিনজনের সামনে পিতলের রেকাবিতে কাটা ফল, মিষ্টি আর সেই সঙ্গে চা ধরে দিচ্ছেন। সারদা দেবীর জন্য চিনামাটির পাত্রে ওই একই জলযোগে উপকরণ আনা হয়েছিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে পরম নিষ্ঠাবতী শ্রীশ্রীমা তাঁর সাগরপারের এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে একত্রে বসে খেতে লাগলেন।' ১৭ মার্চ বিকেলে, নীরবে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল বাগবাজারের ওই গলির ভিতরে। সমস্ত সামাজিক অনুশাসন এবং সংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সারদাদেবী বুকে জড়িয়ে নিলেন তাঁর খুকিকে।

১৭ মার্চ বিকেলে, নীরবে একটি বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেল বাগবাজারের ওই গলির ভিতরে। সমস্ত সামাজিক অনুশাসন এবং সংস্কারকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সারদাদেবী বুকে জড়িয়ে নিলেন তাঁর খুকিকে।

উৎকণ্ঠিত চিত্তে স্বামীজি অপেক্ষা করছিলেন রাস্তায়। খবর গেল তাঁর কাছে। আর একটি মুহূর্তও দেরি করলেন না। দৌড়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে সোজা চলে গেলেন দোতলায়। লুটিয়ে পড়লেন সংঘ জননীর চরণে। এর দু'মাস পর, ১৮৯৮-র ২২ মে, বান্ধবী শ্রীমতী হ্যামন্ডকে লেখা একটি চিঠিতে ওইদিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন নিবেদিতা। সারদা দেবী সম্পর্কে লিখছেন – 'She really is, under the simplest, most unassuming guise, one of the strongest and greatest of women.' আর 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে নিবেদিতা লিখেছেন– 'আমার সব সময় মনে হইয়াছে, তিনি যেন ভারতীয় নারীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী।... তাঁহার মধ্যে দেখা যায়, অতি সাধারণ নারীরও অনায়াসলভ্য জ্ঞান ও

মাধুর্য; তথাপি আমার নিকট তাঁহার শিষ্টাতার আভিজাত্য ও মহৎ উদার হৃদয় তাঁহার দেবীত্বের মতোই বিস্ময়কর মনে হইয়াছে।'

কিন্তু ওই একটি দিনের ঘটনাতেই সব কিছু শেষ হয়ে গেল না। বাগবাজারে মেয়েদের স্কুল খুলবেন নিবেদিতা। সে জন্য তাঁকে কলকাতায় থাকতে হবে। কিন্তু কে কলকাতায় তাঁকে ঘর দেবে? কে দেবে আশ্রয়? বিদেশিনী মহিলাকে কেউ যে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিতে চায় না। এমন কী, স্বামীজির অতি ঘনিষ্ঠরাও নিবেদিতাকে তাঁদের বাড়ির অন্দরমহলে স্থান দিতে অরাজি। ১৮৯৮- এর ১ নভেম্বর। বারাণসী ঘুরে সেদিনই কলকাতা ফিরেছেন নিবেদিতা। অবিলম্বে কলকাতায় মেয়ে স্কুল চালু করতে চান। স্বামীজি সেদিন অবস্থান করছিলেন বাগবাজারে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহীভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে। স্টেশন থেকে নিবেদিতা সটান গিয়ে হাজির সেখানে। নিবেদিতা জেদ ধরলেন, যতদিন না আলাদা বাড়ি পাচ্ছেন, ততদিন বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়িতেই থাকবেন। কিন্তু এতে আপত্তি জানিয়ে বসলেন বাগবাজারে সারদা মায়ের বাড়িতে অন্য যে মহিলারা থাকতেন তাঁরা। এই আপত্তির কথা জানা যায় নিবেদিতার 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' গ্রন্থে। নিবেদিতা লিখেছেন – 'যদি আমি ওই সময় যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতাম যে, আমার এই হঠকারিতা কেবল আমার নিরাপরাধা আশ্রয়দাত্রীকে নহে, পরন্তু সুদূর পল্লীগ্রামে তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণকেও সামাজিক গোলযোগের মধ্যে ফেলিবে, তাহা হইলে আমি কখনই ঐরূপ আচরণ করিতাম না।' নিবেদিতার লেখা পড়লেই বোঝা যায়, তাঁকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে শুধু কলকাতায় নয়, জয়রামবাটির মতো তখনকার অজ গাঁয়েও নানাবিধ বিরোধিতার মুখে পড়তে হয়েছিল সারদা দেবীকে। তবু, সমাজপতিদের কাছে মাথা নোয়াননি তিনি স্থান দিয়েছিলেন নিজগৃহে। বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে যতদিন না নিবেদিতার নিজস্ব আবাস খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, ততদিন নিবেদিতা ছিলেন সারদা দেবীর বাড়িতে। এমনকী, বোসপাড়া লেনের বাড়িতে চলে যাওয়ার পরও, সারদা দেবীর কথামতো নিবেদিতাকে দুপুরে সংঘজননীর কাছে এসেই বিশ্রাম নিতে হত। কেননা, সারদা দেবীর মনে হয়েছিল, বোসপাড়া লেনের ছোট্ট বাড়ির ঘুপচি ঘরে গরমের দুপুরে কষ্ট হবে নিবেদিতার। নিবেদিতা লিখেছেন–

'তখনও আমি প্রতি অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর ঘরেই কাটাতাম। গ্রীষ্মকাল আসিলে তাঁহার বিশেষ আদেশে বিশ্রামের জন্য তাঁহার গৃহেই আসিতাম। সেখানে অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবস্থা ছিল।'

১৮৯৮ সালের ১৩ নভেম্বর ছিল কালীপূজা। ওই দিন ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে নিবেদিতার বাড়িতে মেয়েদের স্কুলের পত্তন হল। সারদা দেবী পুজো করে স্কুলের পত্তন করলেন। উপস্থিত ছিলেন স্বামীজি, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দ। নিবেদিতা লিখেছেন – 'ভবিষ্যতের শিক্ষিতা হিন্দু নারী জাতির পক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ অপেক্ষা কোন মহত্তর শুভ লক্ষণ আমি কল্পনা করিতে পারি না।' তাঁর আদরের 'খুকি'-র এই স্কুলটির প্রতি বরাবর সারদা দেবীর কৃপা এবং ভালোবাসা বর্ষিত হয়েছে। নিবেদিতার জীবিতাবস্থায় এবং তার পরেও সারদা দেবী মাঝে মাঝেই এই স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন। স্কুলের খুঁটিনাটি বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন। কোনও ভক্ত যখন আপসোস করে বলেছেন – 'মেয়ের বয়স হয়ে গেল, এখনও বিয়ে হল না।' তার প্রত্যুত্তরে সারদা দেবী বলেছেন– 'এ নিয়ে এত চিন্তার কী আছে বাবা? খুকির স্কুলে দাও, পড়াশোনা করুক। এত তাড়া কিসের।' নিবেদিতা এবং সিস্টার ক্রিস্টিনের স্নেহধন্যা এই স্কুলেরই শিক্ষিকা সুধীরা দেবীকে সংঘজননী সারদা দেবীই পাঠিয়েছিলেন প্রথম বাঙালি মহিলা হিসেবে নার্সিং ট্রেনিং নিতে। বলেছিলেন, 'ফিরে এসে ও সবার সেবা করবে।' মনে রাখতে হবে, সে সময় হিন্দু সমাজে, এমনকি আলোকপ্রাপ্ত ব্রাহ্মদের ভিতরও মহিলাদের নার্সিং ছিল রীতিমতো অবজ্ঞা এবং ঘৃণার কাজ! এই চিরকালীন মাতৃমূর্তিকে চিনেছিলেন নিবেদিতা। ১৯১০ সনের ১১ ডিসেম্বর তাঁর 'আদরিণী মা'-কে নিবেদিতা লিখেছিলেন– 'রাগ-দ্বেষের ঊর্ধ্বে যে গহন প্রশান্তি, সময় সময় তোমার চিন্তা সেখানেই সমাহিত হয় না কি? সেই প্রশান্তি কি পদ্মপত্রে শিশিরবিন্দুর মতো ভগবৎসত্তায় স্পন্দমান স্নিগ্ধ আশীর্বাদ নয়, পৃথিবীর সংস্পর্শে যা কখনও মলিন হয় না?' ❑

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥

[অ : ৪, শ্লোক : ২১]

অনুবাদ ঃ যিনি নিষ্কাম ও সকল প্রকার ভোগ্যবস্তুত্যাগী এবং যাঁহার অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয় সংযত, তিনি জ্ঞান দ্বারা কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হইয়া শরীরধারণের উপযোগী কর্ম মাত্র করেন; কিন্তু তাহাতে পাপপুণ্যভাগী হন না। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীই মুক্ত হন।

[অ : ৪, শ্লোক : ২১]

সচল গৌরাঙ্গ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

শান্তিপুরে ডাক্তারবাবুর চেম্বার। বহু রোগী আসেন তাঁর সেবা প্রার্থী হয়ে। একদিন গঙ্গার অপর পার থেকে সন্তানকে নিয়ে এসেছিলেন এক বাবা। ডাক্তারবাবু রোগী দেখলেন, ওষুধ দিলেন। পথ্যের কথা বুঝিয়ে বলেছিলেন, এই ওষুধ খেয়ে রোগী কেমন থাকে, সেটা যেন পরের দিন তাঁরা অবশ্য জানায়।

রোগী ও তার সঙ্গীরা চলে গেলে পরের পর রোগী দেখলেন, যেমন দিন যাপন করেন আর কী। পরদিন ভোররাত থেকে প্রবল বৃষ্টি, ঝড়, হাওয়া নদী ফুঁসছে, মাঝে মাঝে বজ্রপাত হচ্ছে। ডাক্তারবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন, রোগীর খবর আসবে কী করে? অপেক্ষা করতে করতে সকাল গড়িয়ে দুপুর। তিনি আর স্থির থাকতে পারছেন না। কাল রোগীর চিকিৎসা করলাম, সে কেমন আছে জানতে পারলাম না। ঘরের মধ্যে আনচান করছেন। দুপুর আর বিকেল হতে সময় পায়নি, ডাক্তারবাবু ওষুধ নিয়ে নদীর পারে এলেন ওপারে যাবেন। ঘাটে নৌকো আছে মাঝি নেই।

নদীর জল এতটাই উথাল-পাতাল করছে নৌকা নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অথচ যেতে হবে। ওষুধের শিশি দুটো মাথার ওপর রেখে গায়ের চাদর দিয়ে শক্ত করে পাগড়ি বাঁধলেন। তারপর শ্যামসুন্দরের নাম করে সাঁতরে যখন ওপারে পৌঁছলেন, অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। রোগীর বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা মেরেছেন। রোগীর বাবা দরজা খুলে অবাক, কাকে দেখছেন! তাদের কোনও কথা না শুনে রোগীর ঘরে গেলেন, তারপর রোগী সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ডাক্তারবাবু তার পাশে থাকলেন। ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর নাম ছিল যোগমায়া। তরুণী যোগমায়া সংসারের সমস্ত কাজ নিজহাতে করে সংসারের সবাইকে মায় কাজের লোকদের পর্যন্ত খাইয়ে দাইয়ে প্রায় বিকেলবেলা ভাত নিয়ে বসতেন। মাসের এমন কোনও দিন যায়নি কেউ না কেউ বাড়ির সামনে এসে বলেছে,

তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে ডেকে তিনটে আসন পেতে তিনজনকে বসিয়েছিলেন। আসনে বসে অদ্বৈতাচার্য বলেছিলেন, ‘স্নান করে অন্য বস্ত্র পরে আস।’ তিনি কোনও কথা না বলে তাই করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে ‘নাম’ দিয়েছিলেন। তারপর তিনজনকেই পরপর প্রণাম করলেন।

‘দুটো অন্ন পাই মা?’ যোগমায়া নিজের থালাটা এগিয়ে দিতেন অতিথিকে।

প্রায় রোজই এই ঘটনা ঘটায় যোগমায়ার শাশুড়ি চঞ্চল হয়ে উঠতেন, মেয়েটা তো না খেয়ে মারা যাবে। একদিন বললেন, ‘রোজ এই ঘটনা ঘটলে তুমি তো বাঁচবে না।’ তার উত্তরে যোগমায়া বলেছিলেন, ‘মা, ভগবান এক হাত দিয়ে দিচ্ছেন, অন্য হাতে নিয়ে নিচ্ছেন। আমি কী করতে পারি?’

এক শীতের বিকেলে ডাক্তারবাবুর মা কালীঘাট দর্শনে এসেছিলেন। সেদিন খুব শীত পড়েছিল। মন্দিরে ঢোকার আগে রাস্তায় একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। সন্ধ্যার পর একজন মহিলা রাস্তায়, তাঁর সন্দেহ হয়। কিন্তু কাউকে কিছু বলেন না। ফেরার পথে দেখেন সেই মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। অনুমান সত্যি হয়। তিনি সেই বারাঙ্গনার কাছে গিয়ে গায়ের চাদরটা দিয়ে বলেন, ‘যাও মা বাড়ি যাও। খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।’

অদ্বৈত আচার্যের বংশধর এই ডাক্তারবাবু শান্তিপুর থেকে এসে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। থাকতেন সাঁতরাগাছিতে। হেঁটে আসতেন গঙ্গা পর্যন্ত, ফেরি পার হয়ে আবার হেঁটে সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃত কলেজের পড়া ছেড়ে ভর্তি হলেন মেডিকেল কলেজে। সেটাও সম্পূর্ণ করলেন না। ডাক্তারি পড়ার সময়ে তাঁর এক সহপাঠীকে কলেজের অধ্যক্ষ বিনা অপরাধে অপমান করায়, সব ছাত্রদের নিয়ে অনশনে বসেছিলেন। অধ্যক্ষ নিজের ভুল স্বীকার করলে অনশন ওঠে।

এটাই বোধহয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম সংগঠিত ছাত্র আন্দোলন। ছাত্র অবস্থায় তিনি ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হন এবং নিরাকার উপাসনায় মেতে ওঠেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে প্রচারক করছিলেন শুধু নয়, সভার আচার্যও হতেন। দীর্ঘদিন তিনি ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করার জন্য বহু জায়গায় ঘুরেছেন। ব্রাহ্মসমাজ বেড়েছে। তখন তিনি সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির একদিকে থাকতেন। একদিন রাতে কড়া নাড়ার আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলে দেখেন, অলোক-সামান্য চেহারার তিনজন দাঁড়িয়ে আছেন, চিনতে পারলেন সাদা চুল সাদা দাড়ি নিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষ অদ্বৈতাচার্য, পাশে শ্রীচৈতন্য আর নিত্যানন্দ।

তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন, ঘরে ডেকে তিনটে আসন পেতে তিনজনকে বসিয়েছিলেন। আসনে বসে অদ্বৈতাচার্য বলেছিলেন, ‘স্নান করে অন্য বস্ত্র পরে আস।’ তিনি কোনও কথা না বলে তাই করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁকে ‘নাম’ দিয়েছিলেন। তারপর তিনজনকেই পরপর প্রণাম করলেন। আশীর্বাদ করে তাঁরা চলে যান। সকালে ঘুম থেকে উঠে ভাবলেন, কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম। হঠাৎ চোখ যায় মেঝেতে পাতা তিনটে আসনের ওপর। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেন, যে কাপড় পরে শুয়েছিলেন, এটা সেটা নয়। তাড়াতাড়ি কলঘরে গিয়ে দেখেন, ভিজে কাপড় তখনও সেখানে পড়ে আছে। বুঝলেন আগের রাতের ঘটনা স্বপ্ন নয় সত্য। ব্রাহ্মদের ছাড়তে পারছেন না। আবার মনের জ্বালাও মিটছে না। এক সাধু অবাক হয়েছিলেন যে, তাঁর গুরু নেই। সাধু বলেছিলেন, গুরু ছাড়া ধর্ম হয় না।

পরের দিন সকাল পালটে গেল, গুরু চাই। আবার বেরিয়ে পড়লেন। মন্ত্রদীক্ষা নিতে হবে।

কর্তাভজা, অঘোরপন্থী, কাপালিক, বাউল, রামাৎ, বৌদ্ধযোগী, মুসলমান ফকির সব সম্প্রদায়ে যোগ দিয়ে ধর্ম সাধন করার চেষ্টা করলেন। আশা পূর্ণ হল না। মনে পড়ে সাধু বলেছিলেন, গুরু ছাড়া সাধন হয় না। ঘুরতে ঘুরতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যান। সেখানে বৌদ্ধদের পরিত্যক্ত গুহায় সাধন শুরু করলেন।

ওই পাহাড়েই একদিন দর্শন হয় গুরুদেবের। গুরুদেব কোলে বসিয়ে তাঁকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার সময়ে তাঁর মনে হয়েছিল যেন এক বৈদ্যুতিক শক্তি তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছে। পরে গুরুদেব তাঁকে সাধন প্রণালি শিখিয়ে দেন।

দীক্ষার পর গুরুদেবকে প্রণাম করে তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান আসলে আর গুরুদেবকে দেখতে পাননি। অনেক খুঁজেছেন, পাননি। একদিন নির্জনে শুনলেন, গুরুদেব বলছেন, 'ঘাবড়াও মাত্। ভজন কর, বখতমে সব মিল যায়েগা।'

গুরুর আদেশেই কাশীধামে হরিহরানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস নেন। নাম হয় অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাসী হয়েও গুরুর আদেশে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন। সপরিবারে গিয়েছিলেন রামকৃষ্ণের কাছে দক্ষিণেশ্বরে, দেখেই বুকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, "বটে, তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও ধর্মের এতদূর উচ্চাবস্থা লাভ করেছ? তুমি তাহলে জনক ঋষির ধর্ম যাপন করছ বল। আমার তো ধারণা ছিল যে তুমি সংসারে উদাসীন হয়ে কেশববাবুর সঙ্গে ভ্রমণ করছ। তুমিই ধন্য, তুমি আদর্শ দেখালে, জগতে যা দুর্লভ।"

ডাক্তারবাবু সাধারণের কাছে পরিচিত সদ্গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নামে। ত্রৈলঙ্গ স্বামী বলেছিলেন, 'বাচ্চা সাচ্চা হ্যায়'। লোকনাথ বাবা বলতেন, 'সচল গৌরাঙ্গ'। জন্মেছিলেন কচুবনে, মৃত্যু হয়েছিল বিষ মেশানো জগন্নাথের প্রসাদ খেয়ে। যিশু জন্মেছিলেন আস্তাবলে, বুদ্ধ গাছের তলায়, শ্রীরামকৃষ্ণ ছাইয়ের মধ্যে। সব মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যু কেমন যেন অস্বাভাবিক।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ধর্ম কাকে বলে? তিনি বলেছিলেন, 'স্বভাবের নামই ধর্ম'। আবার প্রশ্ন করা হল, ধর্মের তাৎপর্য কী?

– যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম শৈত্যগুণ, বৃক্ষের ধর্ম ফল-পুষ্প প্রদান করা, অসীমজ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর প্রত্যেক পদার্থ ও প্রত্যেক বস্তুকে এক একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সৃষ্টি করেছেন। সেই উদ্দেশ্য প্রতিপালনের জন্য সকলকেই একটি প্রকৃতি বা স্বভাব দান করেছেন। এই স্বভাব অনুসারে কার্য করলে নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। অতএব অগ্নি, জল, সূর্যের ন্যায় মনুষ্যেরও স্বভাব আছে।

সেই স্বভাবই মানুষের ধর্ম। সকল পুষ্প উৎপন্ন করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে নিহিত আছে। বীজটি মৃত্তিকায় রোপিত হইলে, রস, আলোক, উত্তাপ, বায়ু, আকাশ প্রভৃতি বাহ্য উপকরণের সাহায্যে অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিবর্ধিত হয়। এইরূপে মানবের আত্মাতে সমস্ত ভাব নিহিত করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃজন করেন। শিক্ষা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায়ে আত্মা প্রস্ফুটিত হয়। ❑

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥
[অ : ৪, শ্লোক : ৩৮]

অনুবাদ ঃ ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞান-নাশক ও অত্যন্ত শুদ্ধিকর। ইহার তুল্য পবিত্র বস্তু ইহলোকে বা পরলোকে আর কিছু নাই। দীর্ঘকাল প্রযত্ন দ্বারা কর্মযোগে চিত্ত শুদ্ধ হইলে মুমুক্ষু স্বীয় আত্মাতে সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন।
[অ : ৪, শ্লোক : ৩৮]

অনাসক্তি-যোগ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

এক দিক দিয়া কর্মমাত্রই বন্ধনস্বরূপ – ইহা নির্বিবাদে স্বীকার্য, আর এক দিক দিয়া দেখিলে, দেহী ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কর্ম করিয়াই যাইতেছে। শারীরিক ও মানসিক চেষ্টামাত্রই কর্ম। তাহা হইলে মানুষ কর্ম করিতে করিতে কেমন করিয়া বন্ধন-মুক্ত থাকিতে পারে? এই সমস্যার সমাধান গীতা যে রীতিতে করিয়াছেন, আর কোনও ধর্ম-গ্রন্থ সে ভাবে করেন নাই। গীতা বলিতেছেন–'ফলাসক্তি ছাড় ও কর্ম কর', 'নিরাশী হইয়া কর্ম কর', 'নিষ্কাম হইয়া কর্ম কর'। গীতার এই ধ্বনি ভুলিবার নহে। যে কর্ম ছাড়ে সে পড়ে, কর্ম করিয়াও যে ফল ত্যাগ করে সে উঠে।

এখানে ফলত্যাগ অর্থে, ত্যাগীর ফল মিলে না – এরূপ অর্থ যেন কেহ না করেন। গীতার মধ্যে এরূপ অর্থের কোনও স্থান নাই। ফলত্যাগ মানে ফলের বিষয়ে আসক্তির অভাব। বাস্তবিক ফলত্যাগীর হাজার গুণ ফল মিলে। গীতায় ফলত্যাগে অখণ্ড শ্রদ্ধার পরীক্ষা রহিয়াছে। যে মানুষ ফলের দিকে লক্ষ্য করিয়া কার্য করে সে বহুবার কর্ম ও কর্তব্য-ভ্রষ্ট হয়। তাহার ভিতর অধীরতা আসে তাহা হইতে সে ক্রোধের বশীভূত হইয়া পড়ে এবং পরে যাহা করা উচিত নয় তাহা করিতে থাকে। সে এক কর্ম হইতে কর্মে লাগিয়া যায়। ফলাফল-চিন্তাকারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মত হয়। অবশেষে সে বিষয়ীর মত ভাল-মন্দ-নীতি-অনীতির বিবেক ছাড়িয়া দেয় এবং ফল পাওয়ার জন্যই সমস্ত সাধনের ব্যবহার করে ও তাহাই ধর্ম বলিয়া মানে। ফলাসক্তির এই রকম কটু পরিণাম হইতে গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্মফলত্যাগের সিদ্ধান্ত বাহির করিয়া জগতের নিকট অতিশয় চিত্তাকর্ষক ভাষায় উহা উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণত ইহাই স্বীকার করা হয় যে, ধর্ম ও অর্থ পরস্পর-বিরোধী; ব্যবসা ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে ধর্ম অচল। ধর্মের ব্যবহার কেবল মোক্ষের জন্য; ধর্মের স্থানে ধর্ম, অর্থের স্থানে অর্থ শোভা পায়। গীতাকার এই ভ্রম দূর করিয়াছেন। যে ধর্ম ব্যবহারে আনা যায় না তাহা ধর্ম নহে – এই প্রকার ভাব গীতায় বিদ্যমান। অর্থাৎ গীতার অভিপ্রায় অনুসারে, যে-কর্ম আসক্তি ছাড়া হইতে পারে না তাহা ত্যাজ্য। এই সুবর্ণ-নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্ম-সঙ্কটে বাঁচাইয়া থাকে। এই অভিপ্রায় অনুসারে খুন, লুট, ব্যভিচার ইত্যাদি কর্ম সহজেই পরিত্যাজ্য হইয়া পড়ে ও এই সহজ ভাব হইতে শান্তি উৎপন্ন হয়। ফলত্যাগ অর্থে পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার দরকার নাই– এমনও নহে। পরিণাম ও তাহার সাধনের বিচার এবং তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এইগুলি থাকার পর যে ব্যক্তি ফলে ইচ্ছা না রাখিয়া সাধনায় তন্ময় থাকে সেই ফলত্যাগী।

ফলত্যাগ অর্থে পরিণাম সম্বন্ধে বিচার করার দরকার নাই– এমনও নহে। পরিণাম ও তাহার সাধনের বিচার এবং তাহার জ্ঞান অত্যাবশ্যক। এইগুলি থাকার পর যে ব্যক্তি ফলে ইচ্ছা না রাখিয়া সাধনায় তন্ময় থাকে সেই ফলত্যাগী।

এই বিচারসমূহ অনুসরণ করিয়া আমার মনে হয়, গীতার শিক্ষা ব্যবহারে পরিণত করিতে সহজেই সত্য ও অহিংসার পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের অসত্য বলিবার লালসা হয় না, হিংসা করারও প্রয়োজন হয় না। যে কোনও হিংসার ও অসত্যের কার্য লইয়া বিচার করিলেই জানা যাইবে যে, তাহার পশ্চাতে ফলের ইচ্ছা আছেই। কিন্তু অহিংসার প্রতিপাদন গীতার বিষয় নহে। গীতাকারের পূর্বেও 'অহিংসা পরম ধর্ম' বলিয়া মানা হইত। গীতায় অনাসক্তির আদর্শ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি গীতার সিদ্ধান্ত অহিংসাই হয়, অথবা অনাসক্তির আদর্শ প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু যদি গীতার সিদ্ধান্ত অহিংসাই হয়, অথবা অনাসক্তিতে অহিংসা যদি সহজেই আসে, তাহা হইলে গীতাকার ভৌতিক যুদ্ধের উদাহরণ লইলেন কেন? গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম বলিয়া মান্য থাকিলেও, ভৌতিক যুদ্ধ একটা সাধারণ বস্তু হওয়াতেই গীতাকার এই যুদ্ধের উদাহরণ লইতে সঙ্কোচ করেন নাই, সঙ্কোচ করাও যায় না। ❑

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥

[অ : ৫, শ্লোক : ১০]

অনুবাদ ঃ যে মুমুক্ষু কর্মফলে আসক্তি ত্যাগপূর্বক পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম করেন, জল যেমন পদ্মপত্রকে আর্দ্র করিতে পারে না, পাপপুণ্য সেইরূপ তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

[অ : ৫, শ্লোক : ১০]

গীতা-ধ্যান

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী

গীতার মতে, পুরুষ ও প্রকৃতি দুই তত্ত্বও নহে, এক তত্ত্ব নহে। তাহারা একই পরম বস্তুর দ্বিবিধ প্রকাশরূপ। একই পুরুষোত্তমের দুইটি প্রকৃতি। পুরুষ ও প্রকৃতি জ্ঞাতা জ্ঞেয়তত্ত্ব বটে – কিন্তু এই সত্য আপাত। চরমে তাহারা উভয়েই জ্ঞেয় তত্ত্ব। ঘড়িটার কাঁটাগুলির চালক তার চাকাগুলি। কিন্তু স্প্রিংয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায় যে, চাকাও চালক নহে, সেও স্প্রিং দ্বারা চালিত। গীতায় পুরুষেরই নামান্তর পরা প্রকৃতি। প্রকৃতির অপর নাম অপরা প্রকৃতি। দু'য়ের জ্ঞাতা অপর একটি পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। পক্ষীর পক্ষদ্বয়ের কর্মক্ষমতা যেমন একটি পক্ষীর দেহে সংলগ্নতায়, পুরুষ প্রকৃতির সত্তা এবং সম্বন্ধ সেইরূপ এক পরম পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কতায়। পাখির অঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইলে যেমন পক্ষদ্বয়ের উড়িবার সামর্থ্য বিন্দুমাত্রও থাকে না, সেইরূপ পরম পুরুষ হইতে পৃথক করিয়া ভাবিলে পুরুষ ও প্রকৃতির সত্তা, সান্নিধ্য ও সম্বন্ধ সকলই সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠে। দুইটি সরল রেখা কোনও একটি জমিকে সীমিত করিতে পারে না। পুরুষ ও প্রকৃতি দুইটি তত্ত্বও বিশ্ব-বৈচিত্র্যের সুষ্ঠু সামাধানে সম্পূর্ণ অপরাগ। যে দর্শন শাস্ত্রে self ও not-self- এর মূলে supreme self -এর সন্ধান নাই, man ও nature-এর মূলে God-এর বিদ্যমানতা নাই, সেই দর্শন শাস্ত্রের অবস্থা মাঝদরিয়ার ডুবু ডুবু নৌকার মত।

শুধু প্রকৃতির পার্শ্বে পুরুষ, পুরুষই বটেন। কিন্তু এই দেখা সংকীর্ণ দেখা। ব্যাপক দৃষ্টিতে পুরুষোত্তমের পার্শ্বে পুরুষ ও প্রকৃতি। তখন তাহারা দুইই প্রকৃতি। পুরুষোত্তম, তাঁহার পরা প্রকৃতি ও তাঁহার অপরা প্রকৃতি – এই ত্রিভুজ তত্ত্বের উপর গীতার দার্শকনিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত।

চন্দ্রের সঙ্গে পৃথিবীর সংযোগে ক্ষয়বৃদ্ধির বিচিত্রতাপূর্ণ তিথি সকলের উদ্ভব। এই কথাটি সত্য কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নহে। কথাটিকে পূর্ণাঙ্গ সত্য করিয়া বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, তিথির বিচিত্রতার আপাত কারণ চন্দ্র ও পৃথিবী হইলেও মূল কারণ দিবপাতি সূর্য। বৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রপঞ্চের আপাত কারণ প্রকৃতি পুরুষের সম্মিলন। কিন্তু মূলীভূত হেতু হইল বিশ্বপতি পুরুষোত্তম।

ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা।/ প্রকৃতি বিদ্ধি যে পরাম ॥/ অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।

এই সকল স্থলে 'মে' ও 'অহং', 'আমার' ও 'আমি' পদের লক্ষ্যীভূত বস্তুই পুরুষোত্তমই।

পরা ও অপরা প্রকৃতিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ তটস্থা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি কহিয়াছেন। এছাড়া আর একটি মহত্তর শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে, যাহার নাম অন্তরঙ্গা শক্তি। এই শক্তির বিলাসে তিনি লীলাময় পুরুষোত্তম, সেইটি অন্তরঙ্গা শক্তি। তটস্থা শক্তিই জীবশক্তি বা পরা প্রকৃতি। এই শক্তি দ্বারা তিনি অনন্ত বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। "যদেদং ধার্য্যতে জগৎ।" আধার যেমন আধেয়কে ধরিয়া রাখে, সেই রূপ জীবশক্তি দৃশ্যপ্রপঞ্চকে ধরিয়া রাখে। পুরুষোত্তম ধরিয়া রাখেন জীবশক্তিকে, জীবশক্তি ধরিয়া রাখেন জগৎকে। শিবের অঙ্কে শিবানী, শিবানীর অঙ্কে সিদ্ধিদাতা।

পরমেশ্বর হইতেই নিখিল বিশ্বের উদ্ভব ও তাহাতেই লয়। তাহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। পুরুষোত্তম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক বস্তু আর অন্য কিছুই নাই "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি"। আমা অপেক্ষা পরতর অন্য আর কিছুই নাই।

জীবশক্তি কেবল জ্ঞাতা নহেন, ভোক্তাও বটেন। বহিরঙ্গা শক্তি জ্ঞেয়ই নহেন, ভোগ্যও বটেন। ভোক্তার জন্যই ভোগ্যের সত্তা। ভোক্তার কর্মানুযায়ী ভোগ্য প্রকৃতির পরিণাম। জীবের কর্মই প্রকৃতির পরিণতি নিয়ামক। এই ভোক্তা ভোগ্য প্রকৃতির পরিণাম। জীবের কর্মই প্রকৃতির পরিণতি নিয়ামক। এই ভোক্তা ভোগ্য উভয় এবং উভয়ের ভোগ পুনরায় পরমেশ্বরের ভোগ্য বস্তু। পরমেশ্বর হইতেই নিখিল বিশ্বের উদ্ভব ও তাহাতেই লয়। তাহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত। পুরুষোত্তম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পারমার্থিক বস্তু আর অন্য কিছুই নাই "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি"। আমা অপেক্ষা পরতর অন্য আর কিছুই নাই। ❑

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥

[অ : ৫, শ্লোক : ১৭]

অনুবাদ ঃ যাঁহাদের বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মে যাঁহাদের আত্মভাব, ব্রহ্মে যাঁহাদের স্থিতি, যাঁহারা ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের সমস্ত পাপ ও পুণ্য বিধৌত হইয়াছে, তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন; তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না।

[অ : ৫, শ্লোক : ১৭]

সমতা

শ্রী অরবিন্দ

যেহেতু জ্ঞান, নিষ্কামতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, সমতা, আভ্যন্তরীণ স্বপ্রতিষ্ঠ শান্তি ও আনন্দ এবং ত্রৈগুণাতীত্য মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, সেই হেতু তাহার সকল কর্মে ঐ সকল গুণ থাকিবেই। সংসারের সকল আঘাত, সকল দ্বন্দ্ব, সকল ঘটনার মধ্যে সে অবিচলিত শান্তভাব রক্ষা করে, তাহার জন্য ঐগুলি একান্ত প্রয়োজন। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে ব্রহ্মের যে সমতাপূর্ণ অক্ষরভাব, এই শান্তভাব তাহারই প্রতিচ্ছায়া; বিশ্বের বহুর মধ্যে যে অখণ্ড পক্ষপাতশূন্য একত্ব চিরকাল অনুস্যূত রহিয়াছে, এই শান্ত ভাব তাহারই কারণ। জগতের অসংখ্য ভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে এই এক ব্রহ্মই সমতা রক্ষা করিতেছে; এবং ব্রহ্মের সমতাই একমাত্র প্রকৃত সমতা। জগতের অন্যান্য বিষয়ে কেবলমাত্র সাদৃশ্য বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে; কিন্তু জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক সদৃশ বস্তুসমূহের মধ্যেও আমরা অসমতা ও ভেদ দেখিতে পাই এবং অসমান বস্তুসমূহকে পরস্পরের সহিত সুসংবদ্ধ করিয়াই জগতে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা স্থাপন করা যাইতে পারে। তাই গীতা কর্মযোগের লক্ষণের মধ্যে সমতার উপর এত অধিক জোর দিয়াছে; মুক্ত আত্মা যে মুক্তভাবে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হয়, এই সমতাই তাহার সন্ধিস্থল। মুক্তপুরুষ যতক্ষণ আত্মজ্ঞান, নিষ্কামতা, নৈর্ব্যক্তিকতা, আনন্দ, ত্রৈগুণাতীত্য লইয়া সংসার হইতে সরিয়া নিজের মধ্যে নিজেকে লইয়াই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ সমতার প্রয়োজন হয় না; যে সকল বস্তুতে সমতা ও অসমতার দ্বন্দ্ব আছে সে সকল বস্তু হইতে সে দূরে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে আত্মা প্রকৃতির ক্রিয়ার বহুত্ব, নামরূপ, ভেদ বৈষম্যের মধ্যে আসে তখনই তাহার মুক্ত অবস্থার অপার লক্ষণগুলিকে এই সমতার ভিতর দিয়াই কার্যে পরিণত করিতে হয়। একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতের বহু জীব ও বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে। এই নৈর্ব্যক্তিকতাতেই এক অক্ষর আত্মা জগতে তাহার বহু নাম-রূপের বৈচিত্র্যের অতীত; জগতের বিভিন্ন নামরূপের সহিত ব্যবহারে আত্মার নৈর্ব্যক্তিকতা প্রকাশিত হয় সকলের প্রতি সম ও নিরপেক্ষ ব্যবহার করিয়া; অবশ্য সকলের সহিত যে একই প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে তাহা নহে – যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অবস্থা ও সম্বন্ধ ভেদে ব্যবহারেরও প্রকারভেদ হইবে বটে কিন্তু সকলের প্রতি সকল ব্যবহারেই ভিতরের ভাব সম ও নিরপেক্ষ রাখিতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের সহিত একত্বের উপলব্ধিই জ্ঞান; জগতের বহু জীব ও বস্তুর সম্পর্কে থাকিয়া এই জ্ঞানকে সত্য করিয়া তুলিতে হইলে, সকলের সহিত সমান একত্ব অনুভব করিতে হইবে।

কৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন–

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

তাঁহার প্রিয় বা ঘৃণাভাজন কেহ নহে, সকলের প্রতিই সমভাব; তথাপি যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত তাহার প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়া, এরূপ ব্যক্তি ভগবানের সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে তাহা আলাদা, এবং সকলেরই প্রভু সেই এক পক্ষপাতশূন্য ভগবান তাঁহার সমীপে যে যেভাবে আসে তাহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। সংসারের বিভিন্ন কাম্যবস্তু আত্মাকে সীমার মধ্যে, বন্ধনের মধ্যে টানিতে চাহিতেছে – অসীম আত্মা তাহার নিষ্কামতায় এই টানের অতীত; আত্মাকে যখন এই সকল বস্তুর সম্পর্কে আসিতে হয়, তখন তাহার নিষ্কামতা প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাদিকে সমান উদাসীনভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করিয়া অথবা সকল বস্তুতে সমান নিরপেক্ষ অনাসক্ত আনন্দবোধ ও প্রেমের দ্বারা; আত্মার সেই আনন্দ স্বপ্রতিষ্ঠ, তাহা কোন বাহ্য বস্তুর লাভালাভের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বরূপত অটল অক্ষয়। এই সমতার দ্বারাই কর্মযোগী তাহার কর্মের মধ্যেও উপলব্ধি করে যে সে মুক্ত। গীতা যে সমতার বিধান দিয়াছে তাহার স্বরূপ খুব উচ্চ ও ব্যাপক; সমতার এই আধ্যাত্মিক স্বরূপই এ বিষয়ে গীতাশিক্ষার বিশেষত্ব। ❑

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥

[অ : ৫, শ্লোক : ২৫]

অনুবাদ ঃ যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম দ্বারা পাপমুক্ত, শ্রবণ ও মনন দ্বারা সংশয়রহিত, নিদিধ্যাসন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় এবং সকল জীবের কল্যাণে নিরত, সেই সদ্যগ্‌দর্শী সন্ন্যাসিগণ ইহজীবনেই ব্রহ্মনির্বাণ (মোক্ষ) লাভ করেন।

[অ : ৫, শ্লোক : ২৫]

শ্রীগীতা

শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ২/৬২
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩

বিষয়-চিন্তা করিতে করিতে মনুষ্যের তাহাতে **আসক্তি** জন্মে, আসক্তি হইতে **কামনা** অর্থাৎ সেই বিষয় লাভের অভিলাষ জন্মে, সেই **কামনা** কোন কারণে প্রতিহত বা বাধাপ্রাপ্ত হইলে প্রতিরোধকের প্রতি **ক্রোধ** জন্মে, **ক্রোধ** হইতে **মোহ**, মোহ হইতে **স্মৃতিভ্রংশ**, স্মৃতিভ্রংশ হইতে **বুদ্ধিনাশ**, বুদ্ধিনাশ হইতে **বিনাশ** ঘটে। ৬২-৬৩

মোহ–বিপর্যয়বুদ্ধি; চিত্তের যে অবস্থায় সকল বস্তুই অযথাবৎ প্রতীয়মান হয়, যাহা যা নয়, তাহা তাই বলিয়া জ্ঞান হয়। স্মৃতিভ্রংশ–শাস্ত্রাচার্যোপদেশ বা কার্যকারণ সম্বন্ধাদির বিস্মৃতি বা অন্তর পুরুষের স্মৃতি।

বিষয়-চিন্তার বিষময় ফল–বিষয়চিন্তাই সর্ব অনর্থের মূল। যাহা অবিরত চিন্তা করা হয়, তাহাতেই আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে তাহা প্রাপ্তির কামনা জন্মে। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ্ বা বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে, তদ্দরুন শাস্ত্রাচার্য-মিত্রাদির উপদেশ বা কার্যকারণ সম্বন্ধবিষয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃতি উপস্থিত হয়। সুতরাং কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ের ক্ষমতা থাকে না। যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয়ে অক্ষম, তাহার মনুষ্যত্ব লোপ পায়, সে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহাই বিনাশ।

বিষয়-চিন্তার বিষময় ফল–বিষয়চিন্তাই সর্ব অনর্থের মূল। যাহা অবিরত চিন্তা করা হয়, তাহাতেই আসক্তি হয়। আসক্তি হইতে তাহা প্রাপ্তির কামনা জন্মে। কামনা প্রতিহত হইলে ক্রোধ জন্মে। ক্রোধ হইতে মোহ্ বা বুদ্ধি-বিপর্যয় ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম-চরিত্রে এই কথাগুলি উদাহরণ দ্বারা পরিস্ফুট করিয়াছেন। নিম্নে দৃষ্টান্তস্বরূপ সাংসারিক জীবনের একটি ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইল–

নলিনীবাবু বিদেশে চাকরি করিতেন, বিদেশেই থাকিতেন। সচ্চিন্তা, সদালাপ, সৎগ্রন্থাদিপাঠ এই সব ভালবাসিতেন। বিষয়ী হইলেও একেবারে বিষয়-কীট ছিলেন না। দেশে একটু তালুক ছিল, তাহা অপরেই ভোগ করিত, সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না। কেহ সে কথা উল্লেখ করিলে বলিতেন– "কার তালুক কে খায়? সকলকেই তিনি (ঈশ্বর) খাওয়াইতেছেন।" কালক্রমে তিনি পেন্সন লইয়া বাড়ি আসিয়া বসিলেন। আয় কামিয়া গেল, তখন তাঁহার ভাবনা হইল, দেশের সম্পত্তি দ্বারা কিছু আয় বৃদ্ধি করা যায় কিনা (বিষয়চিন্তা)। মনে করিলেন, কিছু খামারজমি করিতে পারিলে বেশ সুবিধা হয় (আসক্তি)। নিজেরই অনেক জমি ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, ভোগোত্তর আদি রূপে ন্যায়ত অন্যায়ত অনেকে ভোগ করিতেছিল, তাহার কতক দখল করিতে ইচ্ছা করিলেন (কামনা)। কিন্তু যাহারা একবার গ্রাস করিয়াছে, তাহারা ছাড়িবে কেন? বাধা দিল। তাহাতে তাঁহার বিদ্বেষ ও আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল (ক্রোধ)। তিনি বলিতে লাগিলেন, –'আমার জমি পরে খাবে, আর আমি উপবাসী থাকব? দুষ্ট রাহু চন্দ্র গিলে, চকোর উপবাসী? তা হবে না' (মোহ)। পূর্বে কিন্তু বলিতেন, 'কার তালুক কে খায়?' দেবোত্তরসম্পত্তি বে-দখল করা অধর্ম, পূর্বে অন্যায়ত অধিকৃত হইয়া থাকিলেও দীর্ঘকালের দখলীস্বত্ব নষ্ট হয় না, এ সব কথা তিনি না জানিতেন তা নয়, অনেকে এইরূপ হিতোপদেশও দিলেন, কিন্তু তিনি তাহা শুনিলেন না (স্মৃতিভ্রংশ)। তখন তাঁহার বিবেক-বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল; কৃত্রিমদলিলের সাহায্যে তিনি মোকদ্দমা আরম্ভ করিলেন (বুদ্ধিনাশ)। দলিলাদির কৃত্রিমতা প্রকাশ পাইল। তিনি আদালতে শাস্তিপ্রাপ্ত, সমাজে লজ্জিত, ব্যয়ভারে ঋণগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইলেন (ব্যবহারিকজগতে বিনাশ)। তাঁহার বিষয়ের প্রতি যে নিস্পৃহভাবটুকু ছিল তাহা উড়িয়া গেল, স্মৃতিভ্রংশহেতু উপদেশাদি কার্যকরী হইল না, সংযমবুদ্ধি লোপ পাইল – তিনি পুনরায় ঘোর সংসার–কূপে পতিত হইলেন (আধ্যাত্মিক জগতে বিনাশ বা মৃত্যু)। ❑

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৩০]

অনুবাদ ঃ যিনি সর্বভূতে সকলের আত্মা আমাকে এবং সর্বাত্মা আমাতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তাঁহার ও আমার একাত্মতা হেতু আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য (পরোক্ষ) হন না।
[অ : ৬, শ্লোক : ৩০]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩/৩৮

অনুবাদঃ অগ্নি যেমন ধূম দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণ যেমন ময়লার দ্বারা আবৃত থাকে অথবা গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই জীবাত্মা বিভিন্ন মাত্রায় এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে।

তাৎপর্যঃ জীবের শুদ্ধ চেতনা সাধারণত তিনটি আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যায়। অগ্নি যেমন ধূমের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, দর্পণ যেমন ধূলোর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং গর্ভ যেমন জরায়ুর দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, জীবের শুদ্ধ চেতনাও তেমন কামের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে। কামকে যখন ধূমের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূম আগুনকে ঢেকে রাখলেও যেমন আগুনের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়, তেমনই কামের অন্তরালে শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনা উপলব্ধি করা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়, জীবের অন্তরে যখন অল্প-বিস্তর কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মতো জীবের ভগবদ্ভক্তি কামের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে। আগুনের প্রভাবেই ধূমের উৎপত্তি হয়, কিন্তু আগুন জ্বালাবার প্রথম পর্যায়ে বিশুদ্ধ, নির্মল আগুনকে দেখা যায় না। তেমনই, কৃষ্ণভাবনার প্রাথমিক পর্যায়েও বিশুদ্ধ, নির্মল ভগবৎ-প্রেম প্রকট হয়ে ওঠে না। দর্পণের ধুলো পরিষ্কার করার পর যেমন আবার তাতে সব কিছুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনই, নানা রকম পারমার্থিক প্রচেষ্টার দ্বারা চিত্ত-দর্পণকে মার্জন করবার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভগবানের নাম সমন্বিত মহামন্ত্র উচ্চারণ করা। গর্ভের দ্বারা আচ্ছাদিত জরায়ুর সঙ্গে জীবের বদ্ধ অবস্থার তুলনার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে, এই অবস্থায় জীব কত অসহায়। জঠরস্থ শিশু নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। জীবনের এই অবস্থাকে গাছের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গাছেরাও জীব, কিন্তু প্রবল কামের বশবর্তী হয়ে পড়ার ফলে তারা এমন অবস্থায় পতিত হয়েছে যে, তাদের চেতনা প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে। ধুলোর দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণকে পশু-পক্ষীর সঙ্গে তুলনা করা যায়, আর ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির সঙ্গে মানুষের তুলনা করা যায়। মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হলে জীব তার সুপ্ত কৃষ্ণচেতনাকে জাগিয়ে তুলতে পারে। ধূমাচ্ছাদিত আগুনকে খুব সাবধানতার সঙ্গে হাওয়া দিতে থাকলে, তা যেমন এক সময়ে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে, তেমনই খুব সন্তর্পণে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে মানুষ তার অন্তরে ভগবদ্ভক্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতে পারে। এভাবেই মানুষ্য-জন্মের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে। মনুষ্যজন্ম লাভ করার ফলে জীব তার শত্রু কাম প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে আর তা সম্ভব হয় সদ্গুরুর তত্ত্বাবধানে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করার মাধ্যমে।

> জীবের অন্তরে যখন অল্প-বিস্তর কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ দেখা যায়, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমাচ্ছাদিত অগ্নির মতো জীবের ভগবদ্ভক্তি কামের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে আছে।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥

অনুবাদঃ কামরূপী চির শত্রুর দ্বারা জীবের শুদ্ধ চেতনা আবৃত হয়। এই কাম দুর্বারিত অগ্নির মতো চিরঅতৃপ্ত।

তাৎপর্যঃ মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে যে, ঘি ঢেলে যেমন আগুনকে কখনও নেভানো যায় না, তেমনই কাম উপভোগের দ্বারা কখনই কামের নিবৃত্তি হয় না। জড় জগতে সমস্ত কিছুর কেন্দ্র হচ্ছে যৌন আকর্ষণ, তাই জড় জগৎকে বলা হয় 'মৈথুনাগার' অথবা যৌন জীবনের শিকল। আমরা দেখেছি, অপরাধ করলে মানুষ কারাগারে আবদ্ধ হয়; তেমনই, যারা ভগবানের আইন অমান্য করে, তারাও যৌন জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এই মৈথুনাগারে পতিত হয়। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকে কেন্দ্র করে জড় সভ্যতার উন্নতি লাভের অর্থ হচ্ছে, বদ্ধ জীবদের জড় অস্তিত্বের বন্দিদশার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। তাই, এই কাম হচ্ছে অজ্ঞানতার প্রতীক, যার দ্বারা জীবদের এই জড় জগতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করার সময় সাময়িকভাবে সুখের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই তথাকথিত সুখই হচ্ছে জীবের পরম শত্রু। ❑

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৩২]

অনুবাদ ঃ হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলিয়া অনুভব করেন, আমার মতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।
[অ : ৬, শ্লোক : ৩২]

প্রণব গীতা

শ্রী জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ২/৩৮

বঙ্গানুবাদঃ সুখদুঃখ লাভ অলাভ এবং জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থে যুক্ত (প্রস্তুত) হও, এই রূপে (যুদ্ধ করিলে) তুমি পাপ প্রাপ্ত হইবে না। ৩৮

ব্যাখ্যাঃ সুখ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুঃখ – দুঃ=কলুষিত, খ=আকাশ; বাসনা থাকলেই অন্তরাকাশ আবরণ শক্তিতে ঢেকে যায়, তখন এক অভাবপূর্ণ শূন্যময় আঁধার-ভরা অবস্থা আসে; সুন্দর যে আত্মজ্যোতি, তার রেখামাত্রও দেখতে পাওয়া যায় না; প্রাণ হাঁপাই হাঁপাই করে, মন ব্যাকুল হয়, তাই দুঃখ। সুখ-দুঃখ, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয় সমান করে অর্থাৎ "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" হয়ে, যুদ্ধের নিমিত্তই (গুরু বলছেন বলে) যুদ্ধ করছি, এই রূপে ফলাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দিয়ে কর্তব্যজ্ঞানে যুদ্ধ অর্থাৎ প্রবৃত্তি-নিগ্রহে যত্ন কর। এমনি করলে আর তোমাকে পাপ (চঞ্চলতা, যাতে সাধককে অসাড়ে স্থান ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে হয়) স্পর্শ করবে না অর্থাৎ কর্ম-অকর্ম বিকর্ম যা'তেই থাক, নিরন্তর ব্রাহ্মী-স্থিতি পাবে। ৩৮

সাংখ্য কি? সংখ্যাদ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করাকে সাংখ্য বলে। এতে প্রাকৃতিক চব্বিশ তত্ত্ব আর পুরুষ এক, এই পঁচিশ পদার্থ গণনা করে বিশ্বকোষের সত্তা বোঝা হয়; ইহা অনুমান ও অনুভবসিদ্ধ সমষ্টি জ্ঞান; এজন্য সাংখ্য শব্দে জ্ঞান বোঝায়।

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ২/৩৯

বঙ্গানুবাদঃ হে পার্থ! সাংখ্যমতে এই জ্ঞান তোমাকে বলা হইল, এক্ষণে যোগমতে এই জ্ঞানের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, যে জ্ঞানে যুক্ত হইলে তুমি কর্মবন্ধন পরিত্যাগ করিতে পারিবে। ৩৯

ব্যাখ্যাঃ সাধক! এই যে নিশ্চয় করার বুদ্ধি তোমাকে বলা হল, ইহাই সাংখ্যের মত; কিন্তু সেই বুদ্ধি যোগেতে কিরূপ হয়, তা' শোন– যা'দ্বারা যুক্ত হলে সম্পূর্ণরূপে কর্মবন্ধন ত্যাগ করতে পারবে।

সাংখ্য কি? সংখ্যাদ্বারা বস্তুতত্ত্ব নিরূপণ করাকে সাংখ্য বলে। এতে প্রাকৃতিক চব্বিশ তত্ত্ব আর পুরুষ এক, এই পঁচিশ পদার্থ গণনা করে বিশ্বকোষের সত্তা বোঝা হয়; ইহা অনুমান ও অনুভবসিদ্ধ সমষ্টি জ্ঞান; এজন্য সাংখ্য শব্দে জ্ঞান বোঝায়। আর যোগ? একটিকে আর একটি বস্তুতে মিশিয়ে তদাকারত্ব পাইয়ে দেওয়ার নাম যোগ। এটি সম্পূর্ণ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানসিদ্ধ জ্ঞান। যেমন পৃথ্বীতত্ত্বকে লয় করে রস-তত্ত্বে মিশিয়ে এক করা যোগ, রসকে অমনি করে তেজে মেশান যোগ, তেমনি তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ তন্মাত্রায়, তন্মাত্রা মনে, মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি অহংকারে, অহংকার মহত্তত্ত্বে বা চিত্তে, চিত্ত অব্যক্তে বা মূল প্রকৃতিতে এবং সর্বশেষে প্রকৃতিকে পুরুষে মেশানোর নাম যোগ।

কিন্তু ২৪/২৫ শ্লোকে যা' যা' প্রকাশ হয়েছে, তাই সাংখ্যমতের বুদ্ধি বা জ্ঞান; এতে পৃথিবী হতে আত্মা পর্যন্ত সমুদয় সত্তা প্রত্যক্ষ হতে থাকে। কিন্তু যোগেতে যে জ্ঞান হয়, নিম্ন স্তরসমূহের লয় হতে থাকায়, নীচের জ্ঞান একেবারে ফুরিয়ে গিয়ে, ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বে এসে পরিণত হয়। এই যে বিষয় থেকে গুটিয়ে আনা আত্মমুখী বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হলেই (একমাত্র প্রাণায়ামে ঐরূপ হওয়া যায়, তৎপ্রকরণ গুরুপদেশগম্য) প্রারব্ধ, সঞ্চিত যা'কিছু কর্মবন্ধন, সবই সম্পূর্ণরূপে ছুটে যায়। ৩৯ ❑

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥
[অ : ৬, শ্লোক : ৩৫]

অনুবাদ ঃ শ্রীভগবান্ বলিলেন–হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ধ্যানাভ্যাস এবং ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণা সাধন দ্বারা উহাকে সংযত করা যায়।
[অ : ৬, শ্লোক : ৩৫]

শাস্ত্রোক্ত মতে জ্ঞানের সংজ্ঞা

শ্রী সত্যদাস মঙ্গল

ঈশ্বরের স্বরূপ সাক্ষাৎকার করাকেই 'জ্ঞান' বলে। এই প্রকার জ্ঞানের সঙ্গে যিনি নিত্যযুক্ত রয়েছেন তিনিই নিত্য জ্ঞানী। এমন জ্ঞানীভক্ত সর্বদা 'নিষ্কামী' হয়ে থাকেন। সর্বপ্রকার প্রাকৃত কামনা-বাসনা হতে নিবৃত্ত না হলে কখনও অপ্রাকৃত তত্ত্ব অনুভব করা বা সাক্ষাৎ দর্শন করা সম্ভব নয়।

শ্রীভগবান যে চার প্রকার সুকৃতিশালী ভক্তের কথা বলেছেন, তার মধ্যে এই শেষোক্ত জ্ঞানী ভক্তই উত্তম বলে শ্রীভগবানের নিকট বিবেচিত হয়ে থাকেন। 'জ্ঞান' কী। এ সম্পর্কে প্রথমেই শ্রীমদ্ভাগবতীয় সংজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করা যেতে পারে – নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।/ ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥

শ্রীভগমান্ উদ্ধবকে বলছেন – ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র এই নয়, একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ মহাভূত, সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিনগুণ, – এই অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব প্রত্যক্ষ হয় এবং যার দ্বারা এ সবেতেই এক আত্মতত্ত্ব অনুভব হয় – তাকে আমারই 'জ্ঞান' বলে তুমি জানবে। জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরন্তর্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্।/ প্রত্যক প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দ – সংজ্ঞং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ অর্থাৎ, জড়রূপী ব্রাহ্মণ (জড়ভরত) নৃপতি রহুগণকে বলেছেন, –মহারাজ! বিশুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তর শূন্য, পরিপূর্ণ, অপরিচ্ছন্ন এবং নির্বিকার ভগবৎ পদবাচ্য রূপে যাঁর পারমার্থিক সত্যতা সর্বচরাচরে সনাতন কাল হতেই বিদ্যমান, সেই বাসুদেবকে আপনি জ্ঞান বলে জানবেন।

> বাসুদেব, যিনি সকলের জানার বস্তু – তাই 'জ্ঞেয়'; সকলকে জানেন তিনি – তাই 'জ্ঞাতা' এবং তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ– তাঁকে দিয়ে সব কিছু জানা যায় – তাই তিনি 'জ্ঞান"।

এখন সহজভাবে ভাগবতীয় কথা পরম্পরায়, তাহলে কথা উঠছে জ্ঞান কাকে বলে? সহজ উত্তর হল – যা দিয়ে সব কিছু জানা যায়, তার নাম জ্ঞান। অবশ্য শ্রুতি সেই একই তত্ত্বজ্ঞানকে কোথাও জ্ঞেয় বলেছেন, কোথাও জ্ঞাতা বলেছেন, আবার কোথাও বা তিনিই জ্ঞানস্বরূপ বলে তাঁকে জ্ঞান বলেছেন। অতএব সেই বাসুদেব, যিনি সকলের জানার বস্তু – তাই 'জ্ঞেয়'; সকলকে জানেন তিনি – তাই 'জ্ঞাতা' এবং তিনি নিজে জ্ঞানস্বরূপ– তাঁকে দিয়ে সব কিছু জানা যায় – তাই তিনি 'জ্ঞান"। একবার জগৎ কৃষ্ণময় ভাবতে শিখলে সেই ভাবনার মধ্যে সব ভাবনা ফুরিয়ে যায়; তখন আর কোন ভাবনাই জগৎ কৃষ্ণ-ভাবনাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণভাবিনী শ্রীমতী রাধিকার ক্ষেত্রে এমন ভাবের দশাটি কেমন, সেই কথাই জানতে শাস্ত্র বলছেন – 'শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদ বিধায়নী।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনায় এমন ভাবেই মজে থাকতে হবে যে, প্রাকৃত জগতে সকলেই যেন তাকে উন্মাদ বলে ভাবে – তবেই সেই 'জ্ঞান' যা বাসুদেব স্বয়ং – তাঁকে লাভ করা যায়। ভগবান স্বয়ং হলেন জ্ঞানস্বরূপ – সেই স্বরূপে যিনি নিত্যযুক্ত তিনিই জ্ঞানী। অতঃপর শ্রুতি (তথা উপনিষদ) জ্ঞান সম্পর্কে বহু স্থানে বহু ভাবে আলোচনা করেছেন। কঠ উপনিষদে জ্ঞানতত্ত্ব (আত্মতত্ত্ব) বিশদ ভাবে আলোচিত হয়েছে। শুধুমাত্র জ্ঞানের সংজ্ঞা হিসেবে নিরালম্বোপনিষদে কথা উঠেছে–

ঘটপটাদি পদার্থমিবাবিকারং বিকারেষু চৈতন্যং।/ বিনা কিঞ্চিন্নাস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানম্ ॥ অর্থাৎ, যে সাক্ষাৎ অনুভবের দ্বারা বোঝা যায়, ঘট-পট ইত্যাদি পদার্থে এক অভিন্ন চৈতন্য ভিন্ন আর কিছু নেই – সেই সাক্ষাৎ অনুভবকেই 'জ্ঞান' বলে। এই জাতীয় তত্ত্বকথাকেই সহজ করে ফিরিয়ে প্রাতঃনমস্য বৈষ্ণবাচার্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজ সকলকে বলতেন, "এই যে-সামনে এত সব দেখছ, এই ঘটি-বাটি, ইট-পাথর, চিত্রপট, মহাপ্রসাদ সবই কিন্তু ঐ এক জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের প্রকাশ মাত্র।" সবের মধ্যে এমন নিতাইচাঁদকে সাক্ষাৎ জানাই হল 'জ্ঞান'। ❑

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥

[অ : ৭, শ্লোক : ৭]

অনুবাদ ঃ হে ধনঞ্জয়, আমা অপেক্ষা জগতের অন্য শ্রেষ্ঠ কারণ নাই। যেমন সূত্রে মণিসমূহ গ্রথিত হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আত্মভূত আমাতে অনুস্যূত ও বিধৃত রহিয়াছে।

[অ : ৭, শ্লোক : ৭]

মোহ ও অজ্ঞান

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদাৎ ময়া অচ্যুত।/ স্থিতো ঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ – "হে অচ্যুত, আপনার প্রসাদে আমার মোহ ও অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে এবং পরমাত্মাবিষয়ক ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হয়েছে। আমি নিঃসংশয় হয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থিত আছি, এখন আপনার উপদেশ পালন করব; আমার আর অন্য কোন কর্তব্য নেই।"

প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া সংশয় যাবে কী করে? গঠনধর্মী সংশয় সকল জ্ঞানের মূল, এবং জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সংশয় তিরোহিত হয়। জীবনের প্রসঙ্গে এ-ই হলো দর্শনের ভূমিকা। জীবন প্রতি পদে সমস্যা তুলে ধরে, সংশয় ও বিভ্রান্তিতে মন প্রতি মুহূর্তে দীর্ণ হয়ে যায়, এবং আমরা দর্শনের আশ্রয় নিই; দর্শন যেন একটি আলোক বর্তিকার মতো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষের কাছে যেন অল্প পরিমাণ কিছু প্রজ্ঞার সঞ্চয় থাকে, যা তাকে তার জীবনের নিস্তরঙ্গ নদী পার হতে সাহায্য করে। কিন্তু যখন ঝড় ওঠে, মনের উপর পরিস্থিতির চাপ ভারী হয়ে আসে, তখন ঐ সামান্য প্রজ্ঞা আমাদের বাঁচাতে পারে না। তখনই মানুষের মন আরও নির্ভরযোগ্য আলোকের সন্ধান করে। সে বলে: আরও কার্যকর আলো কি আছে, যে আলো কম্পিত হবে না, এবং যাকে সব অবস্থাতেই ব্যবহার করা চলবে?

আমরা আরও স্থিতিশীল প্রজ্ঞালোক চাই, যা আমাদের জীবনের সব অবস্থায় সঙ্গী হবে। দর্শন হলো সেই প্রজ্ঞার সন্ধান, যা নিজে অবিচল থেকে জীবনের পিচ্ছিল পথে আমাদেরকে অবিচলিত থাকতে সাহায্য করে।

আমরা আরও স্থিতিশীল প্রজ্ঞালোক চাই, যা আমাদের জীবনের সব অবস্থায় সঙ্গী হবে। দর্শন হলো সেই প্রজ্ঞার সন্ধান, যা নিজে অবিচল থেকে জীবনের পিচ্ছিল পথে আমাদেরকে অবিচলিত থাকতে সাহায্য করে। আমরা একটা অচঞ্চল প্রজ্ঞা চাই, যা আমাদের জীবন-তরণীকে প্রতিকূলতার ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে পথ দেখিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাবে। বেদান্তের সেই ক্ষমতা আছে যার দ্বারা সে আমাদের এমন প্রজ্ঞা দিতে পারে যাতে আমরা আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের এই প্রজ্ঞা দান করতে চাইছেন; সংশয় ও বিভ্রান্তির মধ্যে যাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় – এমন প্রকৃত জ্ঞানের উপদেশ তিনি দান করতে চাইছেন।

আমরা দেখি, এই শিক্ষার ফলে অর্জুনের সংশয়-নিরসন হয়েছে এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ যা বলবেন তা-ই করতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে সুনির্দিষ্ট কিছু করতে আদেশ দিলেন না। তিনি বললেন, 'আমি তোমাকে সেই প্রজ্ঞা দান করেছি যা সূক্ষ্মতমের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম; এটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ কর, তারপর যা সব থেকে বেশি যুক্তিযুক্ত বলে বুঝবে তেমন কর্ম কর।' "তাঁরাই শ্রেষ্ঠ আচার্য যাঁরা শিষ্যদের তাদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে সাহায্য করেন; কখনো একগুচ্ছ পূর্বনির্ধারিত সমাধান তাদের উপর চাপিয়ে দেন না। তাঁরা কখনো শিষ্যদের তাদের স্বাধীন বিচারক্ষমতা জলাঞ্জলি দিতে বলেন না। মহৎ কারও নাম করলেই যে তাতে আমাদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি সরিয়ে রাখতে হবে, এমন নয়। শ্রীকৃষ্ণ এমনটাই বলতেন, বলতেন মহান বুদ্ধও। বস্তুত, প্রত্যেক আদর্শ আচার্যই তাই বলতেন। তাঁরা যা বলেছেন তা আদ্যোপান্ত বিচার কর। কিংবা, কঠোপনিষদে যম যেমন বলেছেন – প্রথমেই আচার্য ও তাঁর উপদেশ বিচার কর, তারপর তা গ্রহণ কর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, মহাজন যেমন টাকা বাজিয়ে নেয়, গুরুকে সেরকম বাজিয়ে নিবি।

একথা তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন। এইরকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন এমন শিক্ষকের সংখ্যা কত কম, ভাবলে অবাক হতে হয়। ❑

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥
[অ : ৭, শ্লোক : ১৯]

অনুবাদ ঃ জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। কারণ বহু জন্মের সাধন-ফলে শেষ জন্মে 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেবই' (ব্রহ্মই) এইরূপ জানিয়া তিনি আমাকে নিরতিশয় প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করেন। সেইরূপ মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ।
[অ : ৭, শ্লোক : ১৯]

দেববাণী

স্বামী বিবেকানন্দ

জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ করো। সর্বস্ব দিয়ে দাও, আর ফিরে কিছু চেও না। ভালবাসা দাও, সাহায্য দাও, সেবা দাও, যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও; কিন্তু সাবধান, বিনিময়ে কিছু চেও না। কোন শর্ত করো না। তা হলেই তোমার ঘাড়েও কোন শর্ত চাপবে না। আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই– ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন। ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা, জগতের সকলেই তো দোকানদার মাত্র।... তাঁর সই করা চেক যোগাড় কর, সর্বত্রই তার খাতির হবে।

ঈশ্বর অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ – তিনি উপলব্ধির বস্তু; কিন্তু তাঁকে কখনও 'ইতি ইতি' করে নির্দেশ করা যায় না। আমরা যখন দুঃখকষ্ট ও সংঘর্ষের মধ্যে পড়ি, তখন জগৎটা আমাদের কাছে একটা অতি ভয়ানক স্থান বলে মনে হয়। কিন্তু যেমন আমরা দু'টো কুকুর-বাচ্চাকে পরস্পর খেলা করতে বা কামড়াকামড়ি করতে দেখি সেদিকে আদৌ মনোযোগ দিই না, জানি যে দু'টোতে মজা করছে, এমনকি মাঝে মাঝে জোরে এক-আধটা কামড় লাগলেও জানি যে, তাতে বিশেষ কিছু অনিষ্ট হবে না, তেমনি আমাদেরও মারামারি ইত্যাদি যা কিছু – সব ঈশ্বরের চক্ষে খেলা বই আর কিছু নয়। এই জগতটা সবই কেবল খেলার জন্য – ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপন্ন করতে পারে না।

এই জগতটা সবই কেবল খেলার জন্য – ভগবানের এতে শুধু মজাই হয়। জগতে যাই হোক না কেন, কিছুতেই তাঁর কোপ উৎপন্ন করতে পারে না।

'পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী।
একে মন-মাঝি আনাড়ি, রিপু ছ'জন কুজন দাঁড়ী,
কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি, হাবুডুবু খেয়ে মরি;
ভেঙে গেছে ভক্তির হাল, উড়ে গেল শ্রদ্ধার পাল,
তরী হল বানচাল, উপায় কি করি?
উপায় না দেখে আর, নীলকমল ভেবেছে সার,
তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার দুর্গানামের ভেলা ধরি।'

মা, তোমার প্রকাশ যে-শুধু সাধুতেই আছে আর পাপীতে নেই, তা নয়; এ প্রকাশ প্রেমিকের ভিতরেও যেমন, হত্যাকারীর ভিতরেও তেমনি রয়েছে। মা সকলের মধ্য দিয়েই আপনাকে অভিব্যক্ত করছেন। অশুচি বস্তুর উপর পড়লেও আলোক অশুচি হয় না, আবার শুচি বস্তুর উপর পড়লেও তার গুণ বাড়ে না। আলোক নিত্যশুদ্ধ, সদা অপরিণামী। সকল প্রাণীর পেছনের সেই 'সৌম্যাৎ সৌমতরা', নিত্যশুদ্ধস্বভাবা, সদা অপরিণামিনী মা রয়েছেন।

'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥'

তিনি দুঃখকষ্টে, ক্ষুধাতৃষ্ণার মধ্যেও রয়েছেন, আবার সুখের ভিতরও রয়েছেন। 'যখন ভ্রমর মধু পান করে, তখন প্রভুই ভ্রমর-রূপে মধু পান করেন। ঈশ্বরই সর্বত্র রয়েছেন জেনে জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিন্দা-স্তুতি দুইই ছেড়ে দেন। জেনে রাখো যে, কিছুতেই তোমার কোনও অনিষ্ট করতে পারে না। কি করে করবে? তুমি কি মুক্ত নও? তুমি আত্মা নও? তিনি আমাদের প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোতের শ্রোত্র-স্বরূপ। আমরা সংসারের মধ্য দিয়ে চলেছি, যেন পাহারাওয়ালা আমাদের ধরবার জন্য পিছু পিছু ছুটছে। তাই আমরা জগতের যা সৌন্দর্য, তার শুধু ঈষৎ আভাস মাত্রই দেখে থাকি। এই যে আমাদের এত ভয়, ওটা জড়কে সত্য বলে বিশ্বাস করা থেকে এসেছে। পিছনে মন রয়েছে বলেই জড়তার সত্তা লাভ করে আমরা জগৎ বলে যা দেখেছি, তা প্রকৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ঈশ্বরই। সাহসী ও অকপট হও – তারপর তুমি যে পথে ইচ্ছা ভক্তি বিশ্বাসের সহিত চল, অবশ্যই সেই পূর্ণ বস্তুকে লাভ করবে। ❑

সর্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মুর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

[অ : ৮, শ্লোক : ১২-১৩]

অনুবাদ ঃ সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে নিজের প্রাণ স্থাপনকরত যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া একাক্ষর ব্রহ্মনাম ওঁ উচ্চারণপূর্বক তাঁহার অর্থরূপ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

[অ : ৮, শ্লোক : ১২-১৩]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ

শ্রী সুরেশ চন্দ্র দত্ত

মায়াকে চিনতে পারলে সে তখনই পালায়। এক গুরু শিষ্যের বাড়ি যাচ্ছিলেন, সঙ্গে চাকর ছিল না। পথের মাঝে এক মুচীকে দেখতে পেয়ে বললেন, "ওরে আমার সঙ্গে যাবি? ভাল খেতে পাবি আদরে থাকবি, চল্ না।" মুচী বললে, "ঠাকুর আমি অতি নীচ জাত, কেমন করে আপনার চাকর হয়ে যাব?" গুরু বললেন, "তাতে তোর চিন্তা নেই; তুই কাউকে আপনার পরিচয় দিসনি কি কারুর সঙ্গে আলাপ করিসনি।" মুচী রাজি হলো। সন্ধ্যার সময় শিষ্যের বাড়িতে গুরু সন্ধ্যা করছেন, এমন সময় আর একজন ব্রাহ্মণ এসে সেই চাকরকে বললেন, "অমুক জায়গা থেকে আমার জুতো জোড়া এনে দেতো?" চাকর কথা কইলো না। ব্রাহ্মণ আবার বললেন, সে তাতেও চুপ করে রইলো। ব্রাহ্মণ তিন চারবার বললেন, সে তবু নড়লো না। শেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হয়ে বললেন, "আরে বেটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিসনে তুই কি জাত মুচী নাকি?" মুচী এ কথা শুনে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গুরুর দিকে চেয়ে বললো, "ঠাকুরমশাই গো! ঠাকুরমশাই গো! আমায় চিনেছে আমি পালাই।" সে তক্ষুণি পালালো।

জীবাত্মা পরমাত্মা একই, তফাত এই যে, বড়ো ও ছোট – আশ্রয় ও আশ্রিত। সমুদ্রের জল দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গেলে তা নয় – স্বচ্ছ নির্মল। কৃষ্ণের রূপ দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গেলে তা নয় – স্বচ্ছ নির্মল।

হরিদাস বাঘের মুখোশ মুখে দিয়ে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। মা এসে ছেলেকে শান্ত করবার জন্য বললেন, "ওকে আবার ভয় কি? ও যে আমাদের হরে। ও কাগজের মুখোশ মুখে দিয়েছে।" সে তাতেও থামলো না; পরে যখন হরিদাস মুখোশ খুলে তার সামনে এসে দাঁড়ালো ও মুখোশটি তার হাতে দিয়ে শান্ত করলো তখন সে বুঝলো, আর মুখোশে ভয় পায় না। সেই রকম মায়ার ভিতর যিনি আছেন, তাঁকে জানতে পারলে আর মায়াকে ভয় হয় না।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা কিরূপ?

যেমন স্রোতের জলে একটি লাঠি বা তক্তা আড় করে ধরলে দু'ভাগ দেখায়, তেমন অখণ্ড পরমাত্মা মায়ারূপ উপাধি দ্বারা দু'ভাগ দেখায়। যেমন জল ও জলের বুদ্বুদ। এক বুদ্বুদ যেমন জলেই ওঠে, জলেই থাকে ও জলেই মেশায়, তেমন জীবাত্মা পরমাত্মা একই, তফাত এই যে, বড়ো ও ছোট – আশ্রয় ও আশ্রিত। সমুদ্রের জল দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গেলে তা নয় – স্বচ্ছ নির্মল। কৃষ্ণের রূপ দূর থেকে কালো দেখায়, কাছে গেলে তা নয় – স্বচ্ছ নির্মল।

কলের জাহাজ নিজে অনায়াসে চলে যায় ও বড় বড় গাধা বোট্‌কে টেনে নিয়ে যায়, তেমন মহাপুরুষ যখন আসেন, তখন তিনি অনায়াসে বদ্ধ লোকদের টেনে নিয়ে যান। যখন বন্যা আসে তখন খানা, ডোবা সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বৃষ্টিতে সামান্য নালা দিয়ে কষ্টে জল যায় মাত্র। যখন মহাপুরুষ আসেন; সকলেই তাঁর কৃপায় তরে যায়। সিদ্ধ লোকে কষ্টে-সৃষ্টে আপনি ঈশ্বর লাভ করে চলে যান।

বড় বড় বাহাদুরি কাঠ যখন ভেসে যায়, তখন কতো লোক তার উপর চড়ে ভেসে যায়। তাতে সে ডোবে না। হাবাতে কাঠে সামান্য একটা কাক বসলেই ডুবে যায় তেমন যখন মহাপুরুষ আসেন; কত লোক তাঁকে আশ্রয় করে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে-সৃষ্টে যায় মাত্র।

রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কতো মাল বোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম পাপ বোঝাই সংসারী লোকদের ঈশ্বরের কাছে টেনে নিয়ে যায়। সাধু মহাজনদের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদের কাছে তাঁদের আদর হয়, এর কারণ কি?

বাজীকরের বাজী তাদের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোক দেখে অবাক হয়ে যায়। ❑

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥
[অ : ৯, শ্লোক : ১৮]

অনুবাদ ঃ আমিই প্রাণীর পরা গতি ও পরিপালক। আমি প্রভু ও সকল প্রাণীর বাসস্থান ও তাহাদের কৃতাকৃতের সাক্ষী। আমিই রক্ষক ও প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ হিতকারী। আমিই স্রষ্টা ও সংহর্তা। আমিই আধার ও প্রলয়স্থান এবং আমিই জগতের অক্ষয় কারণ।

[অ : ৯, শ্লোক : ১৮]

সত্যানুসরণ

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তা-ই ধর্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই, আর তার কোনও প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনকি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দুধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ওসবগুলি মত। কোনও মতের সঙ্গে কোনও মতের প্রকৃতপক্ষে কোনও বিরোধ নেই, ভাবের বিভিন্নতা, রকমফের – একটাকেই নানা প্রকারে একরকম অনুভব! সব মতই সাধনা বিস্তারে জন্য, তবে তা নানাপ্রকারে হতে পারে; আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই অনুভূতি, জ্ঞান। তাই ধর্ম অনুভূতির উপর। যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়, সবারই কথা শোন; আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই কর। জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায় আর কোনও রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনওই শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহঙ্কারই কাউকে শিখতে দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহংটা যখনই মিলিয়ে যায়, জীব তখনই সর্বগুণসম্পন্ন-নির্গুণ হয়।

যার উপর যা কিছু সব দাঁড়িয়ে আছে তা-ই ধর্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ। ধর্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম একই, আর তার কোনও প্রকার নেই। মত বহু হতে পারে, এমনকি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না।

যদি পরীক্ষক সেজে অহঙ্কার নিয়ে সদ্‌গুরু কিংবা প্রেমী সাধুজনকে পরীক্ষা করতে যাও তবে তুমি তাঁতে তোমাকেই দেখবে, ঠকে আসবে। সদগুরুকে পরীক্ষা করতে হলে তাঁর নিকট সঙ্কীর্ণ-সংস্কারবিহীন হয়ে ভালোবাসার হৃদয় নিয়ে, দীন এবং নিরহঙ্কার হয়ে যেতে পারলে তাঁর দয়ায় সন্তুষ্ট হওয়া যেতে পারে। তাঁকে অহংয়ের কষ্টিপাথরে কষা যায় না, কিন্তু তিনি প্রকৃত দীনতারূপ ভেড়ার শিঙে খণ্ডবিখণ্ড হন। হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জনায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে তার জ্যোতি বেরয় না, তিনি তো তেমনি সংসারে অতি সাধারণ জীবের মতো থাকেন, কেবল প্রেমের প্রক্ষালনেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমীই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমীর সঙ্গ কর, সৎসঙ্গ কর, তিনি আপনিই প্রকট হবেন। অহঙ্কারী গলিত-অহংকে কী করে জানতে পারবে? তার কাছে একটা কিম্ভূতকিমাকার - যেমন অজমূর্খের কাছে মহাপণ্ডিত।

সত্যদর্শীর আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা কর এবং বিনয়ের সহিত স্বাধীন মত প্রকাশ কর। বই পড়ে বই হয়ে যেও না, তার essence (সার)-কে মজ্জাগত করতে চেষ্টা কর। Pull the husk to draw the seed. (তুষটা ফেলে শস্যটা নিতে হয়)। উপর উপর দেখেই কিছু ছেড়ো না বা কোনও মত প্রকাশ কর না। কোনও-কিছুর শেষ না দেখলে তার সম্বন্ধে জ্ঞানই হয় না, আর না জানলে তুমি তার বিষয় কী মত প্রকাশ করবে? যাই কেন কর না, তার ভিতর সত্য দেখতে চেষ্টা কর। সত্য দেখা মানেই তাকে আগাগোড়া জানা, আর তাই জ্ঞান। যা তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না।

নিজের দোষ জেনেও যদি তুমি তা ত্যাগ করতে না পার, তবে কোনও মতেই তার সমর্থন করে অন্যের সর্বনাশ কর না। তুমি যদি সৎ হও, তোমার দেখাদেখি হাজার হাজার লোক সৎ হয়ে পড়বে। আর যদি অসৎ হও, তোমার দুর্দশার জন্য সমবেদনা প্রকাশের কেউই থাকবে না; কারণ তুমি অসৎ হয়ে তোমার চারিদিকই অসৎ করে ফেলেছ। তুমি ঠিক ঠিক জেনো যে, তুমি তোমার, তোমার নিজ পরিবারের, দশের এবং দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দায়ী। নাম-যশের আশায় কোনও কাজ করতে যাওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কোনও কাজ নিঃস্বার্থভাবে করতে গেলেই কার্যের অনুরূপ নাম-যশ তোমার সেবা করবেই করবে। ❑

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥

[অ : ১১, শ্লোক : ৫৫]

অনুবাদ ঃ হে পাণ্ডব, যে ব্যক্তি মৎকর্মকারী, মন্নিষ্ঠ, মদ্ভক্ত ও আত্মীয়স্বজনাদিতে আসক্তিশূন্য এবং সর্বভূতে, এমনকি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও বৈরভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

[অ : ১১, শ্লোক : ৫৫]

শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা কথামৃত

গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী

ব্রহ্মের স্বরূপটি কী? সহজ করে বলছেন শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মা।

মায়ের ভাষায়: ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাব প্রকাশ করা যায় না। কারণ স্বভাব বলতে গেলেই এসে পড়ে অভাব। ভাষার মধ্যে তাঁকে আনতে গেলেই তিনি হয়ে পড়েন খণ্ড। তবে প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে বলা হয় সৎ চিৎ আনন্দ। তিনি আছেন তাই সৎ। তিনি জ্ঞানস্বরূপ তাই চিৎ। আর এই সৎ-এর জ্ঞান হলেই তিনি আনন্দ। সত্য বস্তু জানলেই আনন্দ। তাই সৎ চিৎ আনন্দ। কিন্তু স্বরূপত তিনি আনন্দ ও নিরানন্দের ঊর্ধ্বে।

ব্রহ্মকে কেউ বলেন আনন্দ। কেউ বলেন জ্যোতিঃ। কেউ বলেন রূপ। শাস্ত্র বলে সচ্চিদানন্দ। শাস্ত্র বলেছে কতটুকু? শাস্ত্র কীরূপ? না ছাদে উঠবার সিঁড়ির মতো। শাস্ত্র কেবল এই সিঁড়ির ধাপের বর্ণনা দেয় মাত্র। ছাদে উঠলে যা প্রত্যক্ষ করা যায় তার বর্ণনা শাস্ত্রে নেই। কারণ যে একবার ছাদে উঠেছে সে তো নিজেই সব দেখছে। যা দেখছে তার বর্ণনার দরকার নেই। পথের বর্ণনার দরকার। শাস্ত্রেও তাই আছে। তাই শাস্ত্রে তাঁকে বলে সচ্চিদানন্দ। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা-ই বটেন, আবার তিনি তারও ঊর্ধ্বে।

ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা আনন্দে নহে। আনন্দ নিরানন্দের বাইরের এক অবস্থা। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

এই যে দেব-দেবীর মূর্তি দেখা যায় এগুলিও সত্য। সবই সত্য আবার সবই মিথ্যা। এগুলি হল সিঁড়ির ধাপ। এগুলি জীবের নানা অবস্থা। নানা ভাব। যখন যে ভাবে থাকা যায়, সেই অবস্থায় তা সত্য। পরে তা থেকে ঊর্ধ্বে উঠলে ওই ভাবেরও হয় লয়। একেবারে যে লয় হয় তা নয়। যেমন নীচের সিঁড়ি থেকে উপরের সিঁড়িতে ওঠা। নীচের সিঁড়ি একেবারে লোপ পায় না। কিন্তু যে উপরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছে তার পক্ষে তা না থাকারই মতো। এসব ভাবও ঠিক ওই রকম।

ভাবের রাজ্যে আমরা যখন থাকি তখন সব দেব-দেবী আমাদের কাছে সত্য। এই ভাবের রাজ্য ছেড়ে আমরা যখন সত্যের রাজ্যে যাই, তখন ভাব আমাদের মধ্যে লয় হয়ে যায়। দেব-দেবীরাও হয়ে যান মিথ্যা। আমাদের কাছে মিথ্যা হয় বলে যে সকলের কাছেই মিথ্যা হয়ে যায় এমন নয়। তা থেকেই যায়। এই অর্থে আবার দেব-দেবীও সত্য।

তাই বলি, ব্রহ্ম খণ্ড ও অখণ্ডে যুগপৎ আছেন। খণ্ডও তিনি, আবার অখণ্ডও তিনি। খণ্ডতেও তিনি পূর্ণ ভাবে আছেন, আবার অখণ্ডতেও তিনি আছেন পূর্ণ ভাবে। যেমন আমার আঙুল স্পর্শ করলেও আমাকে স্পর্শ করা হয় অথচ আমি আঙুল নই। আমার কাপড় স্পর্শ করলেও আমাকে স্পর্শ করা হল অথচ আমি কাপড় নই। আমার অংশ যেমন আমি, আমার সমগ্রও আমি। এক হয়েও তিনি বহু আবার বহু হয়েও তিনি এক। এটাই তাঁর লীলা। একটি বালুকাতেও তিনি যে ভাবে পূর্ণ, মানুষের মধ্যেও সেই ভাবে পূর্ণ। আবার অখণ্ডতেও সেই ভাবে পূর্ণ।

দুই ভাবে তাতে সর্বদাই বর্তমান রয়েছেন। বহু রূপে আত্মপ্রকাশ করছেন, আবার সেই প্রকাশ থেকে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র আছেন। মানুষ ও স্বরূপে ব্রহ্ম যুগপৎ এই দুই ভাবই লাভ করতে পারে। যে জীবন সত্যই ভগবদজীবন হতে চায় তাকে এই ভাবের সমন্বয় সাধন করতেই হবে। ব্রহ্মের উপর উপলব্ধি করতে না পারলে সাধকের পাওয়া হয় না পূর্ণকে। যাত্রা হয় না শেষ। তবে ইতর জন্তু থেকে মানুষের পার্থক্য এই যে মানুষের মধ্যে আছে এক বিশেষ শক্তি যা দ্বারা সে পারে পূর্ণতা লাভ করতে। মানুষ তাকেই বলে যার হয়েছে মনের হুঁশ। যার মনের হুঁশ হয়নি, যে সর্বদা বিষয়-বাসনায় তন্ময় হয়ে থাকে, তাকে মানুষ বলে না। সে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীও নয়। তা কোনও দিনই হবে না পূর্ণসিদ্ধি। পূর্ণানুভূতি। যে মানুষ বহুকে একেরই বহুরূপ বলে দেখতে পারবে, সেই পূর্ণতা লাভ করতে পারবে।

মৃত্যুকেও অমরত্ব ও অমৃতত্বে পরিবর্তিত করে মানব প্রকৃতিকে তার দিব্যজ্যোতির ও চৈতন্যের প্রকাশ ক্ষেত্র করে তুলতে হবে সক্ষম। তিনিই তো হলেন ব্রহ্মজ্ঞানী মানুষ। ঠিক যেন ভিজা কলশি। দূর হতে দেখলে জলে ভরা মনে হয়। কারণ জলে ভরা কলশিই ভিজা দেখায়। সেই রকম ব্রহ্মজ্ঞ লোকের হাবভাবে আনন্দের মতো একটা ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা আনন্দে নহে। আনন্দ নিরানন্দের বাইরের এক অবস্থা। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ❑

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥

[অ : ১৪, শ্লোক : ২৩]

অনুবাদ ঃ উদাসীন ব্যক্তি যেমন কাহারো পক্ষ অবলম্বন করেন না, সেইরূপ যিনি গুণকার্যের দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনরূপ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন না এবং গুণসকল গুণে প্রবৃত্ত এইরূপ জানিয়া কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলিতভাবে অবস্থান করেন ও আত্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তিনিই গুণাতীত।

[অ : ১৪, শ্লোক : ২৩]

প্রাচীন যুগের শিক্ষার ধারা

শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

ধর্ম উপলব্ধির বস্তু – এবং এই দেহ-মন-বুদ্ধি দ্বারাই সেই ধর্মকে উপলব্ধি করা যায়। দেহ-মন-বুদ্ধির মালিন্য অপসারিত না হলে ধর্মও বিকৃতরূপে প্রকাশ পায়। ঋষিরা যে আধার শুদ্ধির প্রতি এত জোর দিয়েছেন এর প্রধান উদ্দেশ্যই এই। তোমাদের মাঝে যারা যুবক তারা তো উপনিষদাদি পড়ছ, সেই উপনিষদের মাঝে দেখা – এক-একজন শিষ্যের প্রতি আচার্যের কি কঠোর নির্দেশ! এই নির্দেশের ভিতর দিয়েই তারা প্রকৃত মানুষ হয়েছে। সত্যকাম গরু চরিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েছিলেন। গরু চরানো – এ তো একটা তুচ্ছ কাজ; কিন্তু নিষ্ঠার সহিত, শ্রদ্ধার সহিত গুরুবাক্য পালন করেছিলেন বলেই সত্যকাম ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পেরেছিলেন। তোমরাই তো বল, শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল মনুষ্যত্ব অর্জন করা। আমার যেসব কর্ম, যেসব বিধি-নিয়ম আমি প্রবর্তন করেছি, তা মেনে চললে কি যথার্থ মনুষ্যত্ব অর্জন হবে না তোমাদের?

সংশয়বাদী ও বিশ্বাসীর মধ্যে পার্থক্য

সংশয়বাদী দার্শনিকের অভাব নেই জগতে, কিন্তু তারাও একদিন তোমাদের অটুট বিশ্বাস দেখে মুগ্ধ – বিস্মিত না হয়ে পারবে না। পাণ্ডিত্য অর্জন করা, আর মনুষ্যত্ব অর্জন করা এক কথা নয়। তোমরা সবাই তো রাম তীর্থের কথা জান, তিনিও এক জায়গায় বলেছেন – "The reading of books and learning all knowledge is one thing, and to acquire the truth is another. You may read all the sacred scriptures and yet not know the truth." পুঁথিগত বিদ্যা আর সত্যলাভ এক কথা নয়। ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতে হলে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই। বিবেকানন্দ বলতেন, "আমাদের এই Calculating ego টাকে মেরে ফেলতে হবে – তবেই আমরা যথার্থ সত্যের সম্মুখীন হতে পারব।" তোমরা ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্ব বলে খুব জোর দাও – কিন্তু ব্যক্তিত্ব কাকে বলে, আমাদের ব্যক্তিত্ব সত্য কি মিথ্যা, এর রহস্য অবগত আছ কয়জন?

পুঁথিগত বিদ্যা আর সত্যলাভ এক কথা নয়। ব্রহ্মবিদ্যা অর্জন করতে হলে ব্রহ্মবিদ্ গুরুর শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নেই।

"বড় বড় কথা ছেড়ে দিয়ে ছোট ছোট কথাগুলিকে জীবনে রূপ দাও। শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এই দুর্লভ সম্পদগুলিকে লাভ করবার চেষ্টা কর। এই দুর্লভ সম্পদগুলি লাভ করতে পারলে দার্শনিক না হলেও, পণ্ডিত না হলেও কিছু আসবে যাবে না। তখন পণ্ডিত বা দার্শনিকই আসবে তোমাদের কাছে দুটো উপদেশ শুনে প্রাণ জুড়াতে। শ্রদ্ধাপরায়ণ, বিশ্বাসী জগতে যত বড় বড় কার্য সম্পন্ন করেছেন, আর কেউ-ই তেমন পারে নাই। অতীতের ব্যর্থতার কথা ভুলে গিয়ে আবার তোমরা মনুষ্যত্ব অর্জনের দিকে জোর দাও। তোমরা প্রকৃত মানুষ হও – সাধু হও – এই আমার আশা এবং আশীর্বাদ!"

"লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তাহলে তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই; কিন্তু তোমাদের মাঝে অনেকেই আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়েছ। আমি তো তোমাদের কোন কিছু গোপন করি না। আমি তো স্পষ্টই বলেছি, এখনো বলি, তোমরা আমায় ছেড়ে গিয়েছ বেশ, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই – আমার যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, তবে তোমরা এসে তা আমায় ধরিয়ে দাও – আমি যদি তা সত্য বুঝি, তাহলে অবাধে তোমাদের মত গ্রহণ করব – আর যদি তোমাদের ভুল তোমরা বুঝতে পার, তাহলে আবার আমার কাছে ফিরে এসো। কিন্তু কৈ, কেউ তো নিজের দোষ বুঝতে পেরেও ফিরে এলো না। এতেই বুঝি, যথার্থ সত্যপিপাসু তোমাদের মাঝে ক'জন? ❑

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

[অ : ১২, শ্লোক : ১৮-১৯]

অনুবাদ ঃ যিনি আসক্তিহীন এবং শত্রু ও মিত্রে সমবুদ্ধি, যিনি সম্মানে ও অপমানে অবিচলিত, যিনি শীতোষ্ণজনিত সুখে ও দুঃখে নির্বিকার, পরমাত্মাতে স্থিরবুদ্ধি, প্রশংসায় হর্ষ ও নিন্দায় বিষাদশূন্য সুতরাং সংযতবাক্, সর্বাবস্থায় যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট এবং নির্দিষ্ট বাসস্থানহীন তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

[অ : ১২, শ্লোক : ১৮-১৯]

বিবেকচূড়ামণি

শংকরাচার্য

বীণার সৌন্দর্যে বা উহা বাজাইবার নৈপুণ্যে শ্রোতাদের আনন্দ উৎপাদনমাত্র হইতে পারে। ঐ সকল দ্বারা সাম্রাজ্যলাভ হয় না।

ভাষার উপর অধিকার, শব্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য, শাস্ত্রব্যাখ্যায় চাতুর্য, আর কাব্য-অলঙ্কারাদিতে পাণ্ডিত্য, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের ভোগ্যবস্তু প্রাপ্তির সহায়ক হইতে পারে। এ সকল কিন্তু মুক্তিলাভের সহায়তা করে না।

আত্মস্বরূপ অবিজ্ঞাত থাকিলে শাস্ত্রপাঠ নিষ্ফল হয়। আর আত্মস্বরূপ বিজ্ঞাত হওয়ার পর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

মহাবনের সদৃশ্য বিভিন্ন শাস্ত্রসমুদয় চিত্তে সংশয় উৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে। অতএব বিচারশীল ব্যক্তিগণ যত্নের সহিত শ্রবণমননাদি সহায়ে আত্মার স্বরূপ অবগত হইবেন।

অজ্ঞানরূপ সর্পের দ্বারা আহত ব্যক্তির বেদপাঠে বা শাস্ত্রপাঠে কী ফললাভ হয়? আর মন্ত্র বা ঔষধের দ্বারাই বা তাহার কী উপকার হয়? একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধের দ্বারা তাহার মরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ সম্ভব।

ঔষধ পান না করিয়া কেবল 'ঔষধ'-শব্দ উচ্চারণ করিলে রোগ সারে না। অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত কেবল 'ব্রহ্ম'-শব্দের উচ্চারণের দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না। দৃশ্য বলিতে সকল ইন্দ্রিয় এবং মনের অনুভবগোচর বিষয়সমূহ বোঝায়। সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন উপযুক্ত অধিকারী সাধক ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর মুখ হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি মহাবাক্য শ্রবণের ফলে সদ্য আত্মানুভবে সমর্থ হন এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু যে শুষ্ক কঠিন ভূমি চাষ করা হয় নাই, বারিবর্ষণ যেমন তাহার কোনও উপকারে আসে না, শব্দ অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন হইলেও অনধিকারী ব্যক্তি তাহার উচ্চারণের দ্বারা কোন ফল লাভ করে না। সাধকের মন হইতে ভেদজ্ঞান এককালে তিরোহিত হইলে তবে অজ্ঞান সমূলে নষ্ট হইবে। অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে কিনা, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা, ইহা সাধকের নিজের অনুভবের বিষয়।

সাধকের মন হইতে ভেদজ্ঞান এককালে তিরোহিত হইলে তবে অজ্ঞান সমূলে নষ্ট হইবে। অজ্ঞান নষ্ট হইয়াছে কিনা, স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে কিনা, ইহা সাধকের নিজের অনুভবের বিষয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে বিনাশ না করিয়া এবং রাজ্যলক্ষ্মী এবং রাজকোষ ও সৈন্যাদি আয়ত্তে না আনিয়া কেবলমাত্র 'আমি রাজা' এই শব্দের উচ্চারণের দ্বারা কেহ রাজা হইতে পারে না।

ভূগর্ভে রক্ষিত ধনরত্নাদি পাইতে হইলে প্রথমে যেমন যে ব্যক্তি উহার সন্ধান জানেন তাঁহার উপদেশপ্রাপ্তির এবং পরে ভূমি খননের, ধনের উপর স্থাপিত প্রস্তরাদির অপসারণের এবং ধনাদি স্বয়ং গ্রহণের প্রয়োজন হয়, কেবল শব্দ করিলে অর্থাৎ 'ধন, তুমি এস' বলিয়া ডাকিলে ধনলাভ হয় না, সেইরূপ মায়া নির্মুক্ত নিজের শুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইতে হইলে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশপ্রাপ্তির পর মনন-ধ্যানাদির প্রয়োজন হয়। কেবল তর্ক-বিচারের দ্বারা আত্মানুভূতি হয় না।

রোগ হইতে আরোগ্য-লাভের জন্য যেমন নিজেকে ঔষধসেবনাদি করিতে হয়, সেই প্রকার ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য উপযুক্ত সাধনসমূহ অবলম্বন করা বিচারশীল ব্যক্তিগণের কর্তব্য।

আজ তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম। এইরূপ প্রশ্ন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারা সমর্থিত, অতি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর ভাবপূর্ণ এবং মুমুক্ষু ব্যক্তিগণের জ্ঞাতব্য।

হে প্রিয় শিষ্য, তোমাকে যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণের ফলে তুমি অচিরে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

অনিত্য বস্তুসমূহে তীব্র বৈরাগ্য মোক্ষলাভের প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়। ইহার পর মোক্ষলাভের অন্যান্য সহায়ক - শম, দম, তিতিক্ষা ও শ্রুতিবিহিত কর্মসমূহের নিঃশেষে ত্যাগ।

(সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন সাধকের সাধনক্রম এইরূপ) – প্রথমে গুরুমুখে আত্মার স্বরূপ এবং মহাবাক্য-শ্রবণ, তাহার পর শ্রুতি বাক্যের মনন, পরে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সর্বক্ষণ অব্যবহিতভাবে আত্মস্বরূপের ধ্যান। এই সকলের অনুষ্ঠানের ফলে বিচারশীল সাধক বিকল্প রহিত আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এই জীবনেই নির্বাণসুখ লাভ করেন। আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে যে পার্থক্যবিচার তোমার জানা প্রয়োজন তাহা এখন তোমাকে বলিতেছি। উহা ভালোভাবে শুনিয়া নিজের মনে বেশ করিয়া বুঝিয়া লও।

মজ্জা, অস্থি, চর্বি, মাংস, রক্ত, চামড়া ও ত্বক্ - এই সাতটি ধাতুর দ্বারা গঠিত এবং পা, ঊরু, বুক, হাত, পিঠ ও মাথা – এই সকল অঙ্গ ও উপাঙ্গ সংযুক্ত এই শরীর। 'আমি ও আমার' এই প্রকার মোহের আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ, এই দেহকে পণ্ডিতগণ স্থূলশরীর বলিয়া থাকেন। (এই স্থূলশরীরে) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা – এই পাঁচ সূক্ষ্মভূত আছে।

এই সূক্ষ্মভূতসমূহ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া স্থূলশরীর–উৎপত্তির হেতু পাঁচটি স্থূলভূতরূপে পরিণত হয়। পঞ্চসূক্ষ্মভূতের গুণসমূহ ভোক্তা জীবের সুখ-উৎপাদনের জন্য শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ – এই পাঁচটি বিষয়ের রূপগ্রহণ করে। ❑

পথের সাথি

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অপরকে না চটাইয়া নিজ মতবাদ প্রচারের যোগ্যতা তোমাদের প্রয়োজন। কাজে নামিয়া যদি কেবল শত্রু-বৃদ্ধিই হইতে থাকে, আসল কাজ করিবে কখন? স্বল্প সংঘাতের পথই সাধারণত কৌশলী কর্মীর পথ। বৃথা বিবাদ ও অপ্রত্যাশিত কলহ কর্মের ক্ষতি করে।

নিজেকে সর্বতোভাবে নিরপরাধ রাখিতে চেষ্টা কর। যে অপরের অমঙ্গল ভ্রমেও চাহে না, ভগবান নিজ হস্তে তাহার মঙ্গল সাধনা করিয়া থাকেন। নিষ্পাপ নিষ্কলুষ অন্তরে নিজ কর্তব্য করিয়া কৃতার্থ হও।

সৎ যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সতত সহায়, ভগবান তাহার নিয়ত সঙ্গী। তুমি সর্বশক্তি লইয়া পুনরায় চেষ্টা কর। বাধার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া শত শত ব্যক্তি জীবনে কৃতিত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন। তুমি-বা কেন তাহা পারিবে না? আত্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখ এবং পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে কেশরি-বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়। নিজেকে উন্নত করিবার ব্যাপারে 'করিব কিংবা মরিব' ইহাই যাহার পণ, ভগবান স্বহস্তে তাহার গলে জয়মাল্য পরাইয়া দেন।

'সুখ সুখ' করিয়া কাঁদিলেই সুখ আসিবে না। বরং সুখের কথা যত ভুলিয়া থাকিবে, সুখ তত অধিক পরিমাণে আসিবে। সুখের তৃষ্ণাই সকল অসুখের প্রসূতি, সুখের বিস্মৃতিই সকল সুখের জননী। মানুষকে উন্নত জীবনের সন্ধান দেওয়া এক সুমহতী সেবা। উজ্জ্বল জীবন-ধর্মে দীক্ষিত করিয়া উদ্দাম গতিতে অগ্রগমনের পথে তাহাদিগকে প্রধাবিত হইবার উৎসাহ দান এক সুমহৎ কৃতিত্ব। সকল মানুষ সকল মানুষকে মহৎ হইতে, উন্নত হইতে, অভ্যুদয় লাভ করিতে সাহায্য করুক। যে সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেককে পূর্ণতা দিতে আগ্রহী, তাহাই দেব-মানবের সমাজ।

সৎ যাহার ইচ্ছা, ভগবান তাহার সতত সহায়, ভগবান তাহার নিয়ত সঙ্গী। তুমি সর্বশক্তি লইয়া পুনরায় চেষ্টা কর। বাধার প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া শত শত ব্যক্তি জীবনে কৃতিত্ব সঞ্চয় করিয়াছেন। তুমি-বা কেন তাহা পারিবে না?

অসুখ, বিসুখ, অশান্তি সংসারে চিরকালই থাকিবে। তাহারা গমনপথে বারে বারে পায়ে বেড়ি পরাইতে চাহিবে। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই তোমাদিগকে কাজে আগাইয়া যাইতে হইবে। ছুতা-নাতা-অজুহাত সব শিকায় তুলিয়া রাখিয়া প্রতিজনকে প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া ধরিতে ও সমাপন করিতে হইবে। সহস্র জনের দ্বি-সহস্র হস্তে যদি প্রত্যহ একটু একটু করিয়া কাজ হয়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণটা বড় তুচ্ছ হইবে না। ঐক্যই শক্তি, বিচ্ছিন্নতাই দুর্বলতা। তোমাদের বুদ্ধি আছে কিন্তু বল নাই। অর্থাৎ তোমাদের একতা নাই। ঐক্যের অভাব আসে অতি বুদ্ধি হইতে। বুদ্ধির বাহার বেশি খুলিলে নিজেকে জগতের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হয়, অহঙ্কার আসে। অহঙ্কার মিলনের শত্রুতা করে, সমকক্ষকে উপেক্ষা, অনুকক্ষকে অসম্মান ও প্রতিপক্ষকে অপমান করিতে প্ররোচনা দেয়। অহঙ্কার কর্তব্যকর্মের সতর্কতা কমাইয়া দেয়, ফলে অসমাপ্ত ব্রতকে সুসমাপ্ত বলিয়া ভ্রম জন্মে, যজ্ঞে পূর্ণাহুতি হইবার আগেই পথের কুকুর আসিয়া হোমকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করে।

নিখিল বিশ্বের শুভের জন্যই তোমাকে শুভমন্ত হইতে হইবে, সকল মানবের সুখের জন্যই তোমাকে সুখার্জন করিতে হইবে। তোমার আস্বাদনের প্রতিটি কণা বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর সহিত সমভাগে ভাগ করিয়া গ্রহণ করিও। অণু-পরমাণুগুলি মৃত বা জড়-পদার্থ নহে, তাহাদেরও প্রাণ আছে। তুমি যখন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা প্রীতিকর দৃশ্য সম্ভোগ কর, তখন তোমারই দেহস্থ কোটি কোটি অণু-পরমাণু সেই সুখাস্বাদন হইতে বঞ্চিত রহিয়া যায়। এই জন্যই তোমার একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের সুখলাভে তোমার সর্বেন্দ্রিয় পরম পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া ওঠে না।

যদি অবহেলিতকে বক্ষে ধরিতে না পার, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে মনুষ্য জন্ম তোমার মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। পশুপক্ষীরা পরের কথা ভাবে না। মানুষ নিজের বাহিরে দৃষ্টি দিতে সমর্থ বলিয়াই সে জীবের শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ কেবল নিজেকে নিয়াই তোমরা ব্যস্ত আছ, ততক্ষণ তো তোমরা পশু। যেই মুহূর্তে নিজের গণ্ডির বাহিরে দৃষ্টি পড়িল, সেই মুহূর্ত হইতেই তোমাদের দেবত্ব শুরু হইল।

অনন্ত পরমায়ু লইয়া কেহ আসে নাই। যে কয়টি দিন পঞ্চভূতের দেনা না মিটে, সেই অল্প কয়টা দিনের ভিতরে তোমাকে তোমার প্রাণের সর্বাপেক্ষা প্রিয় কার্যগুলি চূড়ান্ত তৃপ্তির সহিত সমাপন করিতে হইবে। সুতরাং কাহারও বসিয়া কাল কাটাইবার অধিকার নাই। ❑

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥

[অ : ১৪, শ্লোক : ২৪]

অনুবাদ ঃ যিনি সুখে ও দুঃখে রাগদ্বেষশূন্য এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁহার সমবুদ্ধি, সেই ধীর ব্যক্তিই গুণাতীত।

[অ : ১৪, শ্লোক : ২৪]

অমৃত সন্ধানের কথা

স্বামী ভূতেশানন্দ

প্রশ্ন : সবাই কি উদ্ধার হয়ে যাবে?

উত্তর : সৃষ্টি প্রবাহাকারে নিত্য অথচ তার আদি নেই। তাই যদি হয়, আদিতেও অনন্ত শেষেও অনন্ত। সবাই যদি উদ্ধার হয়ে যায় তবে সৃষ্টি চলবে কিভাবে? একটা জিনিস হয়, যে তাঁর থেকে আমরা এসেছি, তাঁতেই লয় হব। কিন্তু বীজটা রয়ে গেল। কার্যকারণে লয় হয়। লয় হওয়া মানে আসবে না তো, কিন্তু একেবারে আসবে না তা নয়, কাজেই বীজাকারে থাকে। কারণটা কি? কারণ যদি তিনি হন তুবে সুখ–দুঃখাদি তিনি হলেন। সবই যদি তিনি হচ্ছেন তবে জীব বলে কিছু রইল না।

প্রশ্ন : 'বীজাকার' বলতে কি বুঝব?

উত্তর : এইরূপে না থেকে অন্যরূপে ছিল, যেরূপে ছিল তার মধ্যে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা ছিল, তাকেই বলে 'বীজাকার'। বীজের ভিতরের বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা রয়েছে। গাছটা নেই কিন্তু বীজাকারে গাছটির সম্ভাবনা আছে। যেমন সুষুপ্তিতে আমি কি ছিলুম? ব্যক্তিরূপে থাকি না। সেই অনভিব্যক্ত আমি কি ছিলুম? ব্যক্তিরূপে থাকি না। সেই অনভিব্যক্ত রূপটাকে বলে বীজরূপ। যখন আমরা বলি 'আমার লয় হলো'– আমার যখন লয় হলো তখন আমি রইলুম না; কিন্তু আর সে সংস্কার তা লয় হলো না।

ফলের ইচ্ছে রাখে যারা তাদের জন্য পুণ্য ফল অক্ষয় হয়। আর যারা ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না তারা তাঁকে সব সমর্পণ করে। যারা ফল চায় তাদের অক্ষয় হয়।

প্রশ্ন : নির্বীজ কি?

উত্তর : যখন বীজ থাকে না তখন তাকে নির্বীজ বলা হয়। যদি আমরা জগৎটাকে মিথ্যে বলি তবে তো হাঙ্গামা মিটে যায়! আর কোন প্রশ্ন নেই।

প্রশ্ন : জগৎটা কি মিথ্যে?

উত্তর : যা কিছু পরিবর্তনশীল তা নশ্বর, তবু তাকে সৎ-এর মতো দেখাচ্ছে।

প্রশ্ন : জীবের সংখ্যা তো অনেক, সব মুক্ত হলে কি হবে?

উত্তর : জীবের সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়, সংখ্যাতীত। প্রথমেই কথা হচ্ছে, সবাই মুক্ত হলে সৃষ্টি কি লোপ পেয়ে যাবে? না লোপ হবে না, নতুন নতুন জীব সৃষ্টি হবে। সৃষ্টি প্রবাহাকারে নিত্য। মুক্তি না হলেও এই হবে যে, সে কারণ-ব্রহ্মতে লীন হবে, তারপর আবার সৃষ্টি হলে আসতে হবে। কিন্তু জ্ঞানীদের আসতে হবে না। যত জীব আছে তাদের প্রত্যেকের লয় হলেও বীজাকারে রইল এবং তাদের individuality রইল তখনও। আরেকটা যুক্তি আছে, তোমার মুক্তি হয়ে গেলে অপরের মুক্তি হলো কি না হলো তার কি এসে যায়! ভক্তও যদি লয় হয়ে যায় তবে তাকেও আর মায়িক সৃষ্টির মধ্যে আসতে হবে না। ভক্ত নিত্যে থাকবে।

প্রশ্ন : শেষ জন্ম বলতে কি বুঝব?

উত্তর : আমার ব্যক্তিত্ব কবে আরম্ভ হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার জ্ঞান হলে বুঝব আমার শেষ জন্ম। যুক্তি দিয়ে এইটি ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রশ্ন : 'অনন্ত' কাকে বলে?

উত্তর : সর্বকালব্যাপী, সর্বদেশব্যাপী, সর্ববস্তুব্যাপীকেই 'অনন্ত' বলা হয়। অনন্তের শেষ নেই।

প্রশ্ন : মানুষকে কতবার জন্মগ্রহণ করতে হবে?

উত্তর : ব্যক্তির যে পরিচ্ছিন্ন অবস্থা, নিজেকে যে দেহাদির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ভাবছে, তার যতক্ষণ পর্যন্ত না মুক্তি হবে, তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে।।

আমরা বলি মুক্ত হলেও চলে যায়! কিন্তু যাবেটা কোথায়? মুক্ত হলেও তো সর্বব্যাপী। আমরা দেহাদিতে অভিমান করেছি বলেই আমরা বদ্ধ, কিন্তু আমরা যখন দেহাদিতে অভিমান করি না তখন আমরা মুক্ত।

প্রশ্ন : উপনিষদ্ আর ব্রহ্মসূত্রের সম্বন্ধ কি, মহারাজ?

উত্তর : উপনিষদের বাক্যগুলির, বেদের বাক্যগুলির সমন্বয় হয়েছে 'ব্রহ্মসূত্র' গ্রন্থে। বেদের কথাগুলি যেন সুতোয় গ্রথিত করা হয়েছে – এজন্যে 'ব্রহ্মসূত্র' বলা হয়েছে। ৫৫৫টি 'সূত্র' নিয়ে ব্যাসদেব রচিত 'ব্রহ্মসূত্র'। উপনিষদ বেদকে মনে করিয়ে দেয়। উপনিষদ্ হলো বেদের তত্ত্ব। গীতা হলো, স্মৃতি, আর ব্রহ্মসূত্র হলো ন্যায়, যুক্তি। শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় অর্থাৎ উপনিষদ্, গীতা ও ব্রহ্মসূত্র – এদের একত্রে 'প্রস্থানত্রয়' বলা হয়।

প্রশ্ন : আজ বুদ্ধপূর্ণিমা, মন্দিরে ঠাকুরকে আজ ঠিক বুদ্ধদেবের মতো লাগছে কেন মহারাজ?

উত্তর : তোমার চোখে বুদ্ধ! তোমার চোখে বুদ্ধ-রং লেগেছে, তাই সব বুদ্ধ দেখছ।

প্রশ্ন : আজ অক্ষয় তৃতীয়া, মন্দিরে অনেকক্ষণ ঠাকুরের নাম করেছি।

উত্তর : ভাল! অক্ষয় তৃতীয়াতে পুণ্য কর্ম করলে তার ফল অক্ষয় হয়।

প্রশ্ন : তাঁকে তো সর্ব কর্মফল সমর্পণ করতে হয়, তবে?

উত্তর : ফলের ইচ্ছে রাখে যারা তাদের জন্য পুণ্য ফল অক্ষয় হয়। আর যারা ফলের আকাঙ্ক্ষা করে না তারা তাঁকে সব সমর্পণ করে। যারা ফল চায় তাদের অক্ষয় হয়।

প্রশ্ন : তাঁকে ফল সমর্পণ করাই তো উচিত, মহারাজ?

উত্তর : হ্যাঁ, তাতো বটেই।

প্রশ্ন : আজ অক্ষয় তৃতীয়াতে আপনার বিশেষ উপদেশ কি, মহারাজ?

উত্তর : নতুন উপদেশে আছে কি আর? ভগবানেতে মন-প্রাণ সমর্পণ করা – এই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। এই হলো আজকের দিনের বিশেষ উপদেশ। তাঁর কৃপা হলে সব হবে।

প্রশ্ন : তাঁর কৃপা যেন হয়, মহারাজ।

উত্তর : হ্যাঁ হবে।

প্রশ্ন : 'সুবচনী' কি?

উত্তর : যিনি মঙ্গল করেন, তাঁর বচন শুভ, তাই তিনি 'সুবচনী'। ভগবানের শক্তির কল্যাণকারিণী যে শক্তি তাকেই 'সুবচনী' বলে। লৌকিক দেবতাও আছেন।

প্রশ্ন : ওদিকে মন্দিরে রামনাম হচ্ছে, এদিকে আপনার প্রণামের সময়! সবদিক সামলানো যায় না যে?

উত্তর : আমার মতো এমন একটা যন্ত্র কানে লাগাও। যন্ত্রটা এমন করে রাখবে যে রামনাম ছাড়া অন্য কিছু যেন কানে না ঢোকে।

প্রশ্ন : জাগা ঘরে চুরি বলতে কি বুঝব?

উত্তর : জাগা ঘরে চুরি মানে, আমি এত তোমাকে (ভগবানকে) ডাকছি, তোমার কথা চিন্তা করছি - এটা জাগা ঘর; কিন্তু তোমাকে পাচ্ছি না! ❑

বেতার শব্দ

স্বাগত মুখোপাধ্যায়

'দ্যাখ, রোজ রোজ গান, বাজনা, বক্তৃতা, নাটক, গল্পদাদুর আসর, মহিলা মজলিস– এসব তো চলছেই। কিন্তু অন্যরকম একটা কিছু করে ধাক্কা দিতে হবে শ্রোতাদের।' প্রস্তাব দিলেন বুড়োদা। পরিস্থিতি ছিল এরকম : ১নং গারস্টিন প্লেসে প্রতিদিন একটা জমজমাট আড্ডা হত দুপুরবেলায়। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের শুরুর দিকটা। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পঙ্কজকুমার মল্লিক তো আগে থেকেই ছিলেন। কিন্তু বাংলার সংস্কৃতিবোধকে হাত ধরে মননশীলতার শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদর্শ একটি দল ঠিক পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছিল না। যেন আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতির সেরা টিমের দু'জন সদস্যের অপেক্ষাই ছিল। আর সেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হল যখন কিছুদিনের মধ্যেই বেতার কেন্দ্রে যোগ দিলেন আক্ষরিক অর্থেই দুই মহারথী। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (বাণীকুমার) এবং প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। এই দ্বিতীয়জনই ছিলেন সেই সময়ের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি-সিনেমা জগতের সকলের প্রিয় বড়োদা। তো নিয়ম করে বেতারের নানাবিধ অনুষ্ঠান পরিবেশনের মধ্যেই চলত আড্ডা। সেই আড্ডার কুশীলব কারা ছিলেন? আহা! সব প্রাতঃস্মরণীয় নাম! বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বাণীকুমার, নলিনীকান্ত সরকার, হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট যোগেশ বসু (যিনি গল্পদাদুর আসরের প্রতিষ্ঠাতা), রাইচাঁদ বড়াল, ১৯১১ সালে শিল্ডজয়ী মোহনবাগানের হাফ ব্যাক রাজেন সেন (তিনিই তখন কলকাতা বেতার কেন্দ্রের প্রথম ঘোষক)। তো বুড়োদা সেরকমই এক আড্ডায় প্রবল বর্ষার দিনে প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে নৃপেনবাবু বলেছিলেন, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এই কয়েকটা লোক মিলে প্রোগ্রাম চালাচ্ছি। এর উপর আবার নতুন ধাক্কা! পারব তো? প্রেমাঙ্কুর আতর্থী দমবার পাত্রই ছিলেন না। বিশেষ করে নতুন কিছুর সন্ধান তাঁর চরিত্রের মজ্জাগত। সেই কারণেই তো আর কিছুদিনের মধ্যেই বেতারকেন্দ্র ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে যাবেন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও-য় সিনেমা পরিচালনা করতে! সুতরাং তিনি বললেন, 'ধরো আমরা একদিন রাত ১০টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত বড় বড় গাইয়েদের দিয়ে একটা জলসা মতো ব্যাপার করলুম। শুধু রাতের রাগেই গানবাজনা হবে। কেমন ব্যাপারটা?' উপস্থিত সকলেই আগ্রহী। কিন্তু কী করা যায়... কী করা যায়...! আবার সেই প্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

অসামান্য প্রতিভাধর বাণীকুমার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে একগুচ্ছ গান লিখে ফেললেন। প্রথম লেখা হল, 'অখিল বিমানে', 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে', এরপর ' শান্তি দিলে ভরি'। 'মাগো তব বিণে সঙ্গীত প্রেম ললিত' এবং 'নিখিল আজি সকল ভোলে'।

এরপর তিনি যে প্রস্তাবটি দিলেন সেই মুহূর্তটি বাঙালির সংস্কৃতি মননের ক্যালেন্ডারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা উচিত ছিল, আর নিয়ম করে বর্ষপূর্তি পালন করাই কাম্য ছিল ওই মাহেন্দ্রক্ষণের। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ঠাট্টার সুরে বাণীকুমারকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই তো বাণী রয়েছে। ওই পারবে কিছু বৈদিক শ্লোক জোগাড় করতে। সেরকম কিছু শ্লোক আর গান লিখে ফেলুন বাণী। রাই, পঙ্কজরা সুর দিক। বীরেন শ্লোক আওড়াক! ভোরবেলায় লাগিয়ে দাও। লোকের ভালই লাগবে।' বীরেন্দ্রকৃষ্ণ এবার মুখ খুললেন।

বললেন, 'নৃপেনদা, পুজো আর মাসখানেক পরই আসছে। প্রত্যেকবারই পুজোয় আমি ঠাকুরের সামনে বসে চণ্ডীপাঠ করি। খানিকটা সড়গড় আছে। শ্রীশ্রী চণ্ডীর কাহিনী নিয়ে বেশ গানটান, শ্লোক লাগিয়ে একটা গোগ্রাম যদি করা যায়, কেমন হবে দাদা? আড্ডায় যা হয় আর কী?' এর মধ্যেই একজন আবার খুঁত ধরলেন। বললেন, কায়েতের ছেলে চণ্ডীপাঠ করবে? কেউ আবার আপত্তি না তোলে! বাকিরা হইহই করে তাঁকে বাধা দিলেন। প্রোগ্রাম ডিরেক্টর নৃপেনবাবু বললেন, 'প্রোগ্রাম হবে রেডিওতে। তার আবার কায়েত বামুন কী হে! আমরা কি মন্দিরে গিয়ে পুজো করছি? আরে আমাদের প্রোগ্রামের বাজনা বাজাবে কারা? সেই তো হারমোনিয়ামে আমাদের খুশি মহম্মদ, চেলো বাজাবে আলি, সারেঙ্গি মুন্সি। তা এরা মুসলমান বলে আমি বাদ দেব নাকি? কার সাহস আছে এসব প্রশ্ন তুলবে?' (হ্যাঁ, তখন মানুষের মাপগুলো একটু বড় বড় ছিল তো, তাই এরকম কথা বলার মতো কলজের জোর ছিল)। যাই হোক। প্রস্তাব পাশ। অসামান্য প্রতিভাধর বাণীকুমার মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে একগুচ্ছ গান লিখে ফেললেন। প্রথম লেখা হল, 'অখিল বিমানে', 'বিমানে বিমানে আলোকের গানে', এরপর ' শান্তি দিলে ভরি'। 'মাগো তব বিণে সঙ্গীত প্রেম ললিত' এবং 'নিখিল আজি সকল ভোলে'। সুর দিয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, সাগীর খাঁ, হরিশচন্দ্র বালী। প্রধান গায়ক পঙ্কজকুমার মল্লিক, বিমলভূষণ, কৃষ্ণ ঘোষ, আভাবতী, মাণিকমালা, প্রফুল্লবালা, বীণাপাণি, প্রভাবতী ইত্যাদি বিখ্যাত গাইয়েরা। মহড়ায় কোনও সমস্যা হয়নি। ঘটল একেবারে প্রোগ্রামের দিন। আজকাল যাকে বলে লাইভ। এটা তো সবাই জানে যে, ষাটের দশক পর্যন্ত লাগাতার ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে এই মহিষাসুরমর্দিনী রেকর্ড

করে বাজানো হত না। শিল্পীরা স্টুডিওয় এসে ভোর চারটে থেকে সরাসরি সম্প্রচারে অনুষ্ঠান করতেন। রেকর্ডিং চালানো শুরু হয় অনেক পরে... সত্তরের দশকে। ও, আরও একবার রেকর্ডিং বাজানো হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার দিনে। পরিস্থিতি যা ছিল, তাতে মধ্যরাতে প্রত্যেক শিল্পী বাড়ি থেকে আকাশবাণীতে আসবেন, তা সম্ভবই নয়। সুতরাং ওই একবারই রেকর্ড করে রাখা প্রোগ্রাম বাজানো হয়। যা বলছিলাম, পঙ্কজবাবু আর রাইচাঁদ বড়াল বাদ্যযন্ত্রীদের সব বুঝিয়ে দিলেন। কথা ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র যখন শ্লোক বলবেন, তখন লঘু লয়ে শুধুই সুর আরোপিত হবে পিছন থেকে। আর বীরেনবাবু যখন বাংলায় গদ্য পাঠ করবেন, তখন আবহসংগীত হিসেবে রাগ আলাপ করবেন বাদ্যযন্ত্রীরা। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক আর বাংলা গদ্যের পার্থক্য বুঝতে পারছিলেন না উর্দু ভাষী মুসলমান বাদ্যযন্ত্রীরা। সেটা মহড়ায় বোঝা যায়নি। কিন্তু একেবারে অনুষ্ঠানের সময় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কথার সুরেই দেখা গেল, তাঁরা ওসব সংস্কৃত আর বাংলার বিভাজন রেখে সুর সংযোজনের মধ্যে না গিয়ে গোটা পাঠপর্বেই সমন্বয় রেখে আবহে মৃদু সংগীত বাজিয়ে যাচ্ছেন। রাইচাঁদ, পঙ্কজকুমার, নৃপেনবাবুরা তো সম্প্রচার রুমের বাইরে দাঁড়িয়ে স্তম্ভিত! প্রোগ্রামের বোধহয় দফারফা হয়ে গেল শুরুতেই! কিন্তু একটু পরই দেখা গেল সকলেরই ব্যাপারটা খুব মনে ধরছে। এত সুন্দর সুচারুভাবে পাঠ ও আবহসংগীত বাজছে যে, উর্দু ভাষী মুসলমানদের দেখাদেখি এবার বাকি বাঙালি বাদ্যযন্ত্রীরাও ওভাবেই শুরু করে দিলেন তাঁদের বাদ্যযন্ত্রের আবহ। ব্যস। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব ঝংকারের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হল। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নিজেই একবার বেতার জগৎ পত্রিকায় এই বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, এ যেন স্বয়ং মহামায়া এসে হিন্দু-মুসলমান শিল্পীদের মিলিত প্রচেষ্টায় সুরবৈচিত্র্যের এক সঙ্গম স্থাপন করে দিয়ে গিয়েছিলেন আড়াল থেকে। বাণীকুমার আর পঙ্কজ মল্লিকের মতো এই প্রতিভার যুগলবন্দি আর কোনও অনুষ্ঠান বাঙালি জীবনে এসেছে কি না সন্দেহ আছে। ঝাঁপতালের 'শুভ্রশঙ্খ রবে' তালফেরতার অনন্য উদাহরণ। একাধিক গান চরম অনুশীলন ছাড়া গাওয়াই অসম্ভব। কারণ সমপদী আর বিষমপদীর অত্যাশ্চর্য সমন্বয়। আর তার পাশেই নির্মিত হয়েছে কর্ণাটকী ঘরানার তব অচিন্ত্য। প্রথম দু'বছর অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ষষ্ঠীর ভোরে। পরে সেটি মহালয়ায় সময়ান্তরিত করা হয়। আরও বারকয়েক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু তারপর স্থায়িভাবে মহালয়ার পুণ্যতিথি হয়ে পড়ে এই অমলিন বঙ্গসংস্কৃতির অঙ্গটির আগমনক্ষণ। আর কালে কালে এই অনুষ্ঠানই আপাতত শারদোৎসবের বিউগল বাদক।

কিন্তু এই অপার প্রাপ্তির মধ্যেই ঢুকে রয়েছে একরাশ হারানোর বেদনা। নতুনের পূজারি বাণীকুমার, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পঙ্কজকুমার মল্লিকরা ওই ১৯৩২ সালে একবার লেখা, সুরকরা স্ক্রিপ্টকেই বছর বছর ব্যবহার করে গিয়েছেন নাকি? একেবারেই নয়। বরং ঠিক উলটো। প্রায় প্রতি বছর বাণীকুমার নতুন নতুন গান লিখতেন। পঙ্কজ মল্লিক আরোপ করতেন নতুন সুরের ধারা। পালটে যেতেন গায়ক-গায়িকাও। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পরপর পাঁচ বছর যে গানগুলো ব্যবহার করা হয়েছিল, ঠিক সেগুলিরই একটি সংকলন বাছাই করে আজকের এই মহিষাসুরমর্দিনীর রেকর্ড করা রূপটি আত্মপ্রকাশ করে। যার ১৬টি গানই আমবাঙালির অন্তরে প্রোথিত হয়ে আছে। কিন্তু বাকি গানগুলি কোথায় গেল? হারিয়ে গেল চিরতরে? তাই তো হওয়ার কথা! কারণ সেগুলি যখন গাওয়া হত তখন তো আর রেকর্ডিং হত না। সরাসরি সম্প্রচার। তাহলে উপায় কী? এ তো বাঙালি মননের এক অপূরণীয় ক্ষতি। ঠিক এই ক্ষতিপূরণের লক্ষ্য নিয়েই পঙ্কজকুমার মল্লিকের দৌহিত্র রাজীব গুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী ঝিনুক গুপ্ত নিয়েছেন একটি দুরূহ প্রকল্প। পঙ্কজ মল্লিকের ব্যক্তিগত গানের খাতা উদ্ধার হয়েছে। পাওয়া গিয়েছে সময়ের আঘাতে মলিন হয়ে যাওয়া কাগজের পাতায় থাকা কিছু সোনার লেখনী আর স্বরলিপি। অর্থাৎ বিভিন্ন বছরে মহিষাসুরমর্দিনীর জন্য রচিত ও সুরারোপিত গানের একটি তালিকা। বিগত ১০ বছর ধরে পঙ্কজ মল্লিকের নামাঙ্কিত একটি ফাউন্ডেশনে এই হারিয়ে যাওয়া গানগুলির পুনরুদ্ধার পর্ব চলছে। আপাতত উদ্ধার করা গিয়েছে ২০ থেকে ২২টি গান। মহালয়ার প্রাক্কালে আগামীকাল মহিষাসুরমর্দিনীর হারানো সোনার ঝাঁপির উন্মোচন করবেন রাজীব গুপ্ত এবং ঝিনুক গুপ্ত। এই হারিয়ে যাওয়া গানগুলিকে প্রকাশ করা হবে আই সি সি আর প্রেক্ষাগৃহে। বাণীকুমারের স্বর্ণকলমের স্পর্শ আর পঙ্কজবাবুর সুরের ঝরণা সম্বলিত ওই গানগুলি কোনও না কোনও সময় গেয়েছিলেন আঙুরবালা, অখিলবন্ধু ঘোষ, রবীন বসু, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নালাল ভট্টাচার্য, শচীন গুপ্ত, ধীরেন বসু, অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সুকৃতি ঘোষ, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যদের মতো মণিমানিক্যরা। যার সিংহভাগই আদতে দেবীবন্দনা। অসুরবধের পূর্বে এবং পরে আমরা যে গানগুলি শুনে বড় হলাম, তারই ফাঁকে ফাঁকে ছিল এই নবলব্ধ গানগুলিও। জানা যাচ্ছে 'জাগো দুর্গা'র পাশাপাশি গাওয়া হত 'জাগো হে সৃষ্টিবিধায়ক দেবতা' নামের আর একটি গান।

মহিষাসুর বধ হয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তের গান হিসেবে কয়েক বছর গাওয়া হয়েছিল 'আকাশ যে মধুময় ছন্দে' গানটি। আর এই গানের ঠিক পরই কোনও এক বছরে প্রথম গাওয়া হয় 'ওই গিরি নন্দিনী'। আকাশবাণীর মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানে কোনও না কোনও সময় গীত যে গানগুলির কথা ও সুর পাওয়া যাচ্ছে, তার সবথেকে বড় লোকসানের দিক হল কোন গানটি কে গেয়েছিলেন, তার কোনও নিশ্চিত তথ্যই নেই। অবশ্যই এরকম বহু মানুষ আজও নিশ্চিত ভাবে আছেন, যাঁরা মনে করতে পারেন এবং নিজের কানেই শুনেছেন এরকম হারিয়ে যাওয়া গানগুলি। তাঁদের উদ্দেশ্যেও আহ্বান, তাঁরা যদি সঠিক তথ্য প্রদান করেন, তাহলে বাঙালির এই অমর সৃষ্টির আরও বৈচিত্র্যময় দিকটি নবরূপে উন্মোচিত হবে। হারানো প্রাপ্তি কয়েকটি এরকম গান হল ১) মোহ আবরণ তোলো ২) কচিৎ পিতা কচিন্মাতা ৩) তুমি পূনীহী তামসহারিনী ৪) দেবী প্রপন্যার্তিহরে প্রসীদ ৫) জয় জয় পরমা শংকরী ৬) দরশন দাও মাগো ৭) জাগো হে সৃষ্টিবিধায়ক দেবতা ভৈরব। ৮) আকাশ যে মধুময় ছন্দে ৯) তব বিণে সঙ্গীত প্রেম ললিতে ইত্যাদি।

কিন্তু এখন কি আর এই নস্ট্যালজিয়ার কোনও প্রভাব আছে? ক'জন বাঙালি ভোর চারটেয় উঠে শুনতে বসেন মহিষাসুরমর্দিনী? যেখানে সিডি অনায়াসলভ্য! ইন্টারনেটে ডাউনলোড করা যায়! অনেকেই এই বাস্তব প্রশ্নটি উত্থাপন করতেই পারেন। তাঁরা জানতে চাইতে পারেন, মহিষাসুরমর্দিনী আদৌ কতটা সম্পৃক্ত মহালয়ার সঙ্গে? তাঁদের যুক্তি অবনতমস্তকে মেনে নিয়ে একটা কথাই মনে রাখতে চাই– 'মহিষাসুরমর্দিনী' নামের গালভরা কঠিন শব্দটি আবার কবে উচ্চারণ করেছি আমরা? চিরকাল তো সিংহভাগ বাঙালি ভোর চারটেয় রেডিও অন করে 'মহালয়া' শুনব বলে! আমাদের কাছে তো দু'টো একই শব্দ। যাহা মহিষাসুরমর্দিনী, তাহাই মহালয়া! অতএব আমরা শোনার জন্য রেডি সেই শিহরণ জাগানো উচ্চারণ–

'আশ্বিনের এই শারদপ্রাতে...'। ❑

সৌজন্যে : 'বর্তমান' পত্রিকা

কবিতাঙ্গন

প্রার্থনা
মৃণাল কান্তি মজুমদার

ভক্তিতে হয় মানব মুক্তি
অন্য কোন পথে নয়।
ব্যক্তি স্বার্থ পরিহার করে
ঈশ্বর সাধনায় সম্ভব হয় ॥

জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ মোরা
করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান।
মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা
এই হোক জীবনের গান ॥

পাপ পুণ্যে রেখেছ তুমি প্রভু
এ জগৎ সংসার মাঝে।
প্রকৃত মানুষ হওয়ার শক্তি দাও তুমি
প্রমাণ করতে পারি যেন প্রতি কাজে ॥

ভাল-মন্দে শুভে-অশুভে
জড়িয়ে রেখেছ মন।
জাগ্রত কর বিবেক বুদ্ধি
মানব কল্যাণ যেন হয় পণ ॥

মানুষে মানুষে হচ্ছে যুদ্ধ
ভাইকে মারছে ভাই।
মানবতার অপমান এযে,
প্রকৃতপক্ষে তোমার বিরুদ্ধে লড়াই ॥

চারিদিকে শুধু মারণাস্ত্রের গর্জন
ভেঙ্গে যাচ্ছে শান্তির বাঁধ।
দুষ্টচক্রের বেষ্টনী থেকে
মুক্ত কর, এই হল মনের সাধ ॥

অন্ধকারের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত মোরা
হারিয়ে যাচ্ছে স্নেহ ও ভালবাসা।
দেখাও তুমি আলোর দিশা
জীবন পাক প্রকৃত বাঁচার আশা ॥

জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাও তুমি
তোমার সন্তানদের ঘরে ঘরে।
মানব জীবন যেন সার্থক হয়
তোমায় অহর্নিশ স্মরণ করে ॥

চন্দ্রিমা
পূরবী পাল

শুভ্র চাঁদের আলোর ছটায় জগৎ ভরে ওঠে
প্রস্ফুটিত ফুলের সারি দেখি মাঠে ঘাটে ॥

তোমায় ধরব বলে দু'হাত বাড়াই
পাই না নাগাল তাও–

মেঘের ফাঁকের আড়ালেতে কোথায় চলে যাও?
চাঁদের বুড়ি চরকা কাটে বসে আরাম করে
পেঁজা তুলার রাশি রাশি ছড়ানো চারিধারে ॥

পাহাড়গুলির মাথায় মাথায় গর্ত ভরা ভরা
চক্‌চকে যেন রূপার বাটি যায় না তাদের ধরা ॥

জলের ধারা দেখি না কোথাও জনবসতির বাস

কোথায় আছে পশু, পাখি?
কোথায় তাদের নিবাস?
যুগ যুগান্ত ধরে পৃথিবীর মানুষ মোরা
চেয়েছি চাঁদের দেশে যেতে–

সে চেষ্টাও সফল হয়েছে, যেদিন মানবের
প্রথম পদচিহ্ন পড়েছে তোমার ভূমির 'পরে ॥

স্নিগ্ধ চাঁদের আলো মনে
আনে প্রসন্নতা–
বয়ে আনে শান্তির প্রলাপ
গভীর নবীনতা ॥

তোমার সৃষ্টি; হে মনোহর
দেখাও মোদের আলো
আকাশ 'পরে দিগ দিগন্তে
তোমার উজল ধারা ঢালো ॥

স্বাগতম শারদোৎসবের কাব্যগন্ধী আনন্দনির্ঝর
প্রভুবন্ধু দাস

শহরতলির এক আধা গ্রাম আধা শহরে
উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এক বসত বাড়ির স্মৃতি
হাতছানি দিয়ে বলে–

'ওহে সুন্দরতা পিয়াসি, মনে পড়ে!'
প্রথম সন্ধ্যা ও রাতে সমাসন্ন ঘনায়মান অন্ধকারে,
বর্ষজুড়ে মাটি, ঘাস ও রঙিন ফুল ভরা উঠোনের এক প্রান্তে
ঝলমলে লাল কলাফুল, জবা, দোপাটি আর মোরগফুল
পঞ্চমুখী জবা আর গন্ধরাজের বাহার–

আর শিউলি আর সন্ধ্যামালতী ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা,
ছোট্ট তুলসী বেদির সামনে প্রজ্জ্বলিত মাটির প্রদীপ একধারে,
আর একধারে পিতলের কুপিতে মৃদুমন্দ বাতাসের হিল্লোলে,

কম্পমান সাঁঝের দীপশিখার অনিন্দ্য স্মৃতি!
খুবই কাছে অবস্থান হলেও সৌন্দর্যের
অপার্থিবতা আর রহস্য দিয়ে ঘেরা
ছোট্ট এই দীপালোক হৃদয় আর মনকে পৌঁছে দেয়
আনন্দলোকের এক স্বর্গদুয়ারে।

শেফালি ফুলের ছোট ছোট শাখায় নেচে নেচে
ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র চোখ জুড়োনো টুনটুনি পাখির আনন্দঘন গান!
সতেজ সবুজ পাতায় বুননশিল্পের আশ্চর্য নিদর্শনভরা
টুনটুনি পাখির বাসায় কচিকাঁচার সুখময় জীবন!

সাত সাগর আর তেরো নদী পেরিয়ে সুদূর বিদেশে
শারদোৎসবের বাইরেকার প্রস্তুতি অন্তর্জগতের সাথে যুক্ত হয়ে
বয়ে আনে বঙ্গভূমির আধা গ্রাম আধা শহরতলির সুন্দর এক পরশ,
শরতের শিউলির মাতোয়ারা সুঘ্রাণ, কেরোসিন কুপির শীর্ণ দীপশিখা
আর টুনটুনি পাখির গানের সম্মিলনে, মনের গহনে।
অবশেষে, ধূপধুনোর গন্ধ আর ঢাকের বাদ্যিই সেতুবন্ধ ঘটাবে
বঙ্গভূমির আর বিদেশের শারদোৎসবে!

আনন্দময়ীর আগমনের মধুর প্রতীক্ষা সফল হবে
আগামী সময়ের যথাযথ পরিসর পেরিয়ে!

কবিতাঙ্গন

Ganga, Yamuna, Padma and Meghna are blessed by Mother Durga!

Prabhu Bandhu Das

The celebrations of Durga Puja in Bangladesh and India
Link us at this time with Ganga, Yamuna, Padma and Meghna!

The milieu of India and Bangladesh
With the fragrance of night jasmine flowers in gardens lush and fresh
To declare that the 'celebration of celebrations' is here
Once again for this year!

The mothers Durga, Ganga, Yamuna, Padma and Meghna
As if, form one garland of unadulterated pleasure
To bless the visitors of the two nations this time of the year!

The solemn and awesome beauty
Of the Ganges river at Gangotri
Originates from a glacier at Gomukh ,
And moves with gushing white foamy splashes
Through the Himalayan terrain!

As if, getting released from the matted lock
Of Lord Shiva as goes the legend!

And creates a magnificent view of Mother Ganges
Near her majestic source!

And proceeds to meet the feet of Lord Mahadev
In her forward course!
Lord Shiva makes the Ganges an epitome of divinity.

Sankaracharya refers to her waters
As 'Charanamrit' of Lord Vishnu Sri Hari,
He further wrote – 'Waves of the Ganges are white
Like snow, moon and pearls!

And her feet are adorned with the gems
Of Lord Indra's crown!
An immortal tribute to Mother Ganges
On behalf of all humans born and unborn!

The saints and pilgrims from India and overseas,
Householders, believers as also non-believers,
Are intensely gratified by taking a dip in her water
At dawn, morning, noon, dusk, evening or nighttime!

And watch the Ganges endlessly flowing by from time unknown!
Alone, silently, unsung and without festivities many a time!
But always with a touch of holiness, blissful and kind!
And with jocund festivities, hustle and bustle at other times
On her shores year round!

Every inch of the shore of the Ganges is considered sacred!
But specially blessed are the shores
Of Gangotri, Devprayag and Rishikesh,
Haridwar, Varanasi, Triveni Sangam and Sagar Island
At the confluence of the Bay of Bengal's holiness!

The festivities of annual baths on the occasion of Makar Sankranti,
And Kumbha and Maha Kumbha Mela celebrations draw millions
Every four and twelve years,
Of pilgrims and visitors from the world around
To the shores of the Ganges at these specific times!

The pervasive presence of Mother Ganges,
The trans-boundary river flowing in India and Bangladesh
Is depicted with a real significance,
During the Annual Worship Ceremonies of Mother Durga
When collection of the holy waters of Mother Ganga
Yamuna, Padma and Meghna
Is needed for worship during the days of Durga Puja,
As an essential item of the celebration rituals!

Further, the 'Immersion Ceremonies' of the idols
Of the deities of Durga Puja,
In the waters of the Ganga, Yamuna, Padma and Meghna
Across the trans-boundary domains of India and Bangladesh
At the conclusion of Durga Puja festivities on Dashami Day,

Make the union of Goddess Durga
With the waters of Mothers Ganga, Yamuna, Padma and Meghna
In their separate existence!

And Mother Durga, as if, to bless the visitors and bathers
Will stay there in the bosom
In a quadrangle of these holy and majestic rivers,
Till the Durga Puja repeats next year!

Technology Addiction: The Young Generation

Aunkita Roy

Here is the timeline of a young child's behavior over the course of many years. In grade 1, the child is just beginning to learn how to read and write, so at this age knowledge is minimal. In grade 3, the child has begun to use resources such as different types of websites. In grade 5, the child's knowledge has expanded and by now, they watch videos and already know many popular apps or "social media". In grade 7, they surely have a device that can download social media. It's highly likely that they have social media, and they are socializing with others online. In grade 9, they are now old enough for social media, but they are now using it every day. Did you notice the change from grade 1 to grade 9? The child has become gravitated to technology more and more, just like how a moth is drawn to a flame.

This habit of checking the internet so often will affect the student differently. By relying on technology more and more, the student may get distracted by something online, and will forget about the task at hand.

This habit of checking the internet so often will affect the student differently. By relying on technology more and more, the student may get distracted by something online, and will forget about the task at hand. For most kids, this task is homework. The more you are glued to an app or group chat, the less hard you work. The less hard you work, the less pleasant your grades become. It's like a math equation. Homework-hard work= bad grades. A way to fix this is by maintaining a good balance between everything. Spend at least 1 hour on homework every day and about 30-45 minutes online. That way, the parents, student, and teacher are all happy.

Using technology more means that you are spending more time on a mobile device. This may get you playing a lot of games and/or watching entertaining videos often. This will take time away from doing other things. You will be less active physically and socially, especially around your society. Things like going to the temple or helping out during big events are both ways of being active in your society. The child will always be paying attention to whatever is on the screen more than anything else. Wherever they are, it is highly likely that the child will have the device with them. Even when you are at home, you are busy doing things online, thus ignoring the presence of others around you. This creates distance between people. Also, too much use of technology leads to depression. Research has shown that the sales of antidepressants are on the rise because of people's addiction with devices. When you are talking to someone face to face, you are using gestures, talking to them, and paying attention to their facial expressions. On the contrary, while online you are only texting without using any body language.

I don't say that we shouldn't use technology. I know it's very useful in today's world, but one should not get addicted to it. Parents should always be wise and aware about what a child is viewing online. Remember, use technology sparingly, and always make time for other things that matter.

I wish everyone a happy Durga Puja! ❑

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥

[অ : ১৮, শ্লোক : ১৭]

অনুবাদ ঃ 'আমি কর্তা' এই অভিমান যাঁহার নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না তিনি জগতের সমস্ত প্রাণী হত্যা করিলেও হত্যাকারী হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না।

[অ : ১৮, শ্লোক : ১৭]

ছোটদের পূজা ভাবনা

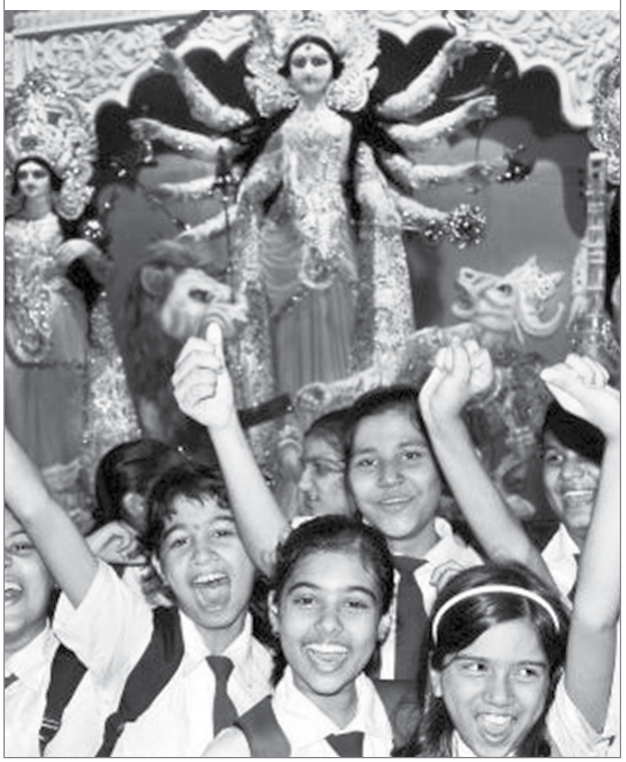

Durga puiga

Anuva Nath

The first Durga puiga ceremony is said to have taken place in 1606 in West Bengla and celebrated by Bhabananda, the ancestor of Maharaja Krishnachandra of Nandia Durga puiga includes the worship of godness Durga as also of Lord Shiva, and her four child. In Hindu mythologly, Lord Shiva is regarded as the husband of Godness Durga. Durga puiga is one of the greatest Hindu religous festival and the biggest holy occassion for the Bengalis that celebrated every year by Hindus across the world. This fantistic festvial celebarates female power in the from of goodness.

About Durga Puja

BY: Prodipta Saha

Nomaskar, my name is Prodipta Saha and I am in Grade 4 and I am going to talk about Durga Puja. Durga Puja is celebrated as the biggest festivol because Maa Durga killed the buffalo demon named Mohishasura.

There are six days of Durga Puja: Mahalaya is the day the modir calls Maa Durga, Shashthi is the first puja of Maa Durga, Saptami is the second day of Durga puja, Astami is the day people fast for Maa Durga and break it, Navami is the fifth day of puja and Dashmi is the day Maa Durga has to go back to her family. We also wish that Maa Durga has a safe journey home.

I go to the mondir every year because to not get a evil eye on my family. Also, Durga Puja is the most important Puja too!

– জয় মা দুর্গা!

Durga Puja

Everyyear we celebrate Durga puja to worship maa Durga, protecting us from evil. 1st day Maa Durga defeating and evil demon called Mahisasur who has angry bull and wants to destroy the world. 2nd day we worship maa Brahmacharini which is one of many good forms of Durga. 3rd day of puja we celebrate maa chandraghanta. However for her devotees, maa is serene, gentle and peaceful. 4th day we also celebrate other form is maa Kusumanda, she has eight hands in which she holds Kamandal, bow, arrow, a jar of nectar (amrita), discus mace and a lotus which blesses her devotees with the Astasiddhis and Nabashiddis. 5th days we celebrate the greatness of Goddess 'Skandamata'. 6th day we worship Goddess Katyayani. She is a very famous and renowned in the ancestry of saints. 7th day we celebrate the appearance of the great Devi Kalratri. She has dark Krishna (black) complexion and her appearance is extremely fearful. 8th day we celebrate Durgas appearance Maha Gowri. She observed austere penance to get lord Shiva's her husband. Due to her severe penance, she became black and dark in colour. But lord Shiva pleased with the intension behind her dark complexion and washed her body with the holy water of Ganda. She became bright and shining Maha Gowri. 9th day the last day of Navaratri we spend our last moment for this year with maa Durga and do many special dance. 10th day of Duregapuja we get really sad so we cover maa with Sidur and drop her in the water her statue drowns but her spirit goes back havens with new memories.

So these are really what we do in the ten days of Durga puja.

By! (Arnab Nath)

By Bandon Gr. 5

Usefulness of attendance in the Sunday class

The reason we need a attendance is because we need to know how many students came to Gita class. If the teachers didn't have this information and a student was lost, but they didn't sign the attendance that means he or she didn't come to Gita class or they forgot to sign the attendance. Why they might be somewhere else in the temple. The attendance talks about your phone number and your name. You have to write your phone number and your name. Then you can go out the door after the class is done. Why these are all the reasons we need a attendance and we got the attendance and lots of students write there phone number and name.

Pollution

Written by: ~~Devary~~ Devarya Roy
Grade 4 age: 9

When water, air, soil in dirty places are called pollution. Pollution is very bad for our health and our environment.

We pollute water in a different way such as laundry, wash our cars, flush the toilet. Air is polluted by burning coal, oil, natural gas or gasoline. Car is powered by gasoline, and gasoline produces carbon dioxide and pollutes our air.

Soil is polluted by agri cultural process like chemical fertilizers, insect killers, etc. Soil is polluted by computer waste too. Now adays our earth is polluted by different ways. For our betterness we should be more careful to be using those things which are polluted in our enviroment.

Listening to My Parents

By: Divyajyoti Roy
Grade: 6 VI

It is our main duty to listening our parents because they show us beautiful Earth by giving birth. Nobody can prosper in life without obeying parents. I like my parents too much.

My parents always help me to learn something. I getting Knowledge and wisdom from them. My parents always tell me to avoid bad things. Stealing and telling lie is the great sin I learn this from my parents. My parents is incomparable. They always try to make me honest and perfect person.

My parents give me lots of time. They take me to school, Gita class, music class, TaeKwondo class or even everywhere. I visited this year in New York with my parents. We visited everyplaces in New York.

My parents always helps me prepare food for me to eat. My parents always try to give me something special.

I listen my parents and they listen me. If I want something nice they fulfill my demand. My parents give me nice shirt, pants, socks, hats, and Jackets. I promises to myself rest of my life I never disobeying my parents. God bless my parents and me.

SIGNIFICANCE OF DURGA PUJA

written by: Monisha Dey Chaudhury Gr: 6

Durga Puja is a festival for Hindus. It is celebrated from the sixth to tenth day of bright lunar fortnight in the Bikram Sambat calendar month of Ashwin. This period falls in the fortnight corresponding to the festival that is called Devi Paksha (fortnight of the Goddess). Devi Paksha is preceded by Mahalaya, the last day of the previous fortnight Pitri Paksha. It is ended on Kojagori Lakshmi Puja (worship of Goddess Lakshmi). Durga Puja marks the victory of Goddess Durga over the evil buffalo demon Mahishashura. Thus, Durga puja epitomises the victory of good over evil. In Bengal, Durga is worshipped as Durgotinashini, the destroyer of evil and protector of her devotees.

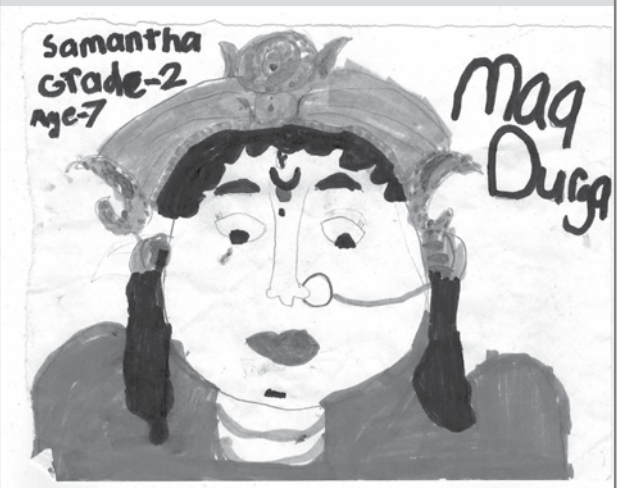

Aug. 1st 2016

ABOUT THE BHAGAVAD GITA

Hello my name is Sourav. Today I'm going to talk about the Bhagavad Gita. This book is very special to me and other Hindus too. This book contains 18 chapters with 700 Sloka that define a certain Chapter. My favorite Chapters and Slokas are Chapter 1 Sloka 1 and chapter 5 Sloka 1. The name's and page's of these chapters are Observing the Battle Feild of Kurukseta, page 33 and Karma yoga - Action in Krishna's conciousness, Page 217. I hope you liked my report about the Bhagavad Gita. Great thanks to Mihir Uncle and Shemal uncle for teaching me about this Holy/Cultural book and helping me strive to be a better person.

Krishna

Name: Sourav P.

Written By: Sourav P.

Grade: 6

Abeer Das, Grade 6

Educational Tour to Parliament

On June 13 we took a tour to Ottawa. We got to meet the Prime Minister of Canada this day! It was the best day of my life.

We took a trip on two coach buses departing from the temple. It took off at 6:00am. We had incredible fun in the bus and the scenario was amazing.

At Ottawa, the parliament was a castle-like structure with a green roof. We went inside the building with 110 people. We met a tour guide who taught us about taxes and path of a succeseful politician.

After that, we met Justin Trudeau. Sadly, we only had 30 minutes with him. Later on we went around the parliament building looking at the incredible politic rooms including the library.

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY, TORONTO
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR, TORONTO

YEARLY PROGRAM

SL. No.	Puja/Broto	Date (Bangla)	Date (English)	Day	Tithi (Ontario Time)
1.	Ganesh Puja	01 Boishakh, Sun rise 6:36 am & set 8:0 pm	14 April, 2016	Thursday	First day of the Bengali year
2.	Shani Puja & Satya Narayan Puja	28 Jaistha, Sun rise 5:59 am & set 8:48 pm	11 June, 2016	Saturday	Puja : Evening (5:30-8:30 pm)
3.	Udoy-Osto Harinam Kirtan	11 Ashar, Sun rise 4:58 am & set 9:47 pm	26 June, 2016	Sunday	Shukla Sunday of Uttarayon
4.	Lord Jagannath Dev's RathaYatra	20 Ashar, Sun rise 5:43 am & set 9:02 pm	05 July, 2016	Tuesday	Dwitia till 5:08 am of next day
5.	Jonmashtomi (Birth Tithhi of Lord Krishna)	8 Vadro, Sun rise 6:34 am & set 8:04 pm	25 August, 2016	Thursday	Oshtomi (3:32 pm of prev day to 1:09 pm)
6.	Vishwakarma Puja	31 Vadro, Sun rise 7:00 am & set 7:23 pm	17 September, 2016	Saturday	Month end of Vadro Puja: morning
7.	Pitri Torpon	8 Ashwin, Sun rise 7:09 am & set 7:08 pm	25 September, 2016	Sunday	Pitripoxkhiyo Dshomi till 6:33pm. Torpon: morning
8.	Durga Puja - Mohaloya	13 Ashwin, Sun rise 7:14 am & set 6:59 pm	30 September, 2016	Friday	Omabosya till 6:56 pm. Puja: Night
9.	Durga Puja - Shosti Bodhon & Odhibas	19 Ashwin, Sun rise 7:22 am & set 6:49 pm	06 October, 2016	Thursday	Shoshtthi till 6:00 am of next day. Puja: Evening
10.	Durga Puja - Soptomee	20 Ashwin, Sun rise 7:23 am & set 6:47 pm	07 October, 2016	Friday	Soptomee till 7:16 am next day Puja: 10:00 am starts
11.	Durga Puja - Oshtomi	21 Ashwin, Sun rise 7:24 am & set 6:45pm	08 October, 2016	Saturday	Oshtomee till 8:04 am next day Puja: 10:00 am
12.	Durga Puja - Nobomi&Sondhi Puja	22 Ashwin, Sun rise 7:25 am & set 6:43 pm	09 October, 2016	Sunday	Nobomee till 8:20 am of next day Puja: 10:00 am, Sondhi Puja: 7:40 am - 8:28 am
13.	Durga Puja - BijoyaDoshomi	24 Ashwin, Sun rise 7:27 am & set 6:40 pm	10 October, 2016	Monday	Doshomee till 8:07 am of next day Puja: 10:00 am
14.	Kojagori Laxmi puja	28 Ashwin, Sunrise 7:32 am & set 6:33 pm	15 October, 2016	Saturday	Purnima till 00:41am next day Puja: Evening
15.	Syama (Kali) Puja	12 Kartik, Sunrise 7:50 am & set 6:12 pm	29 October, 2016	Saturday	Omabosya till12:15 pm next day. Puja: Night
16.	Jogodhatri puja	22 Kartik, Sunrise 7:03 am & set 4:59 pm	08 November, 2016	Tuesday	Novomee till 8:32 pm
17.	Rasleela of Lord Krishna	27Kartik, Sun rise 7:10 am & set 4:54 pm	13 November, 2016	Sunday	Purnima 11:39 am to 8:17 am of next day Puja: Day and Night
18.	Mokor Sonkranti / Poush Parbon & Peettha festival	29 Poush, Sun rise 7:48 am & set 5:06 pm	14 January, 2017	Saturday	Last day of the month of Poush Puja: morning. Pittha: Evening
19.	Saraswati Puja	18 Magh, Sunrise 7:34 am & set 5:29 pm	01 February, 2017	Wednesday	Sukla Ponchomi till 3:41 pm Puja: 10:00 am
20.	Sree Shiva Ratri Vroto	11 Falgun, Sunrise 7:02 am & set 6:00 pm	24 February, 2017	Friday	Choturdoshee till 10:34 am of next day. Puja: Night
21.	Dooljatra, Gour Purnima & Holi Festival	27 Falgun, Sunrise 7:35 am & set 7:20 pm	11 March, 2017	Saturday	Falguni Purnima till 10:21 am next day Puja: Night
22.	Basanti Oshtomi	20 Choitra, Sun rise 6:55 am & set 7:47 pm	03 April, 2017	Monday	Oshtomee till 6:33 am of next day. Puja: morning
23.	Ram Nobomi	21 Choitra, Sun rise 6:53 am & set 7:48 pm	04 April, 2017	Tuesday	Novomee till 3:40 am of next day Puja: morning
24.	Chaitra Sonkranti	31 Choitra, Sun rise 6:37 am & set 7:59 pm	14 April, 2017	Friday	End of the year 1423

SREE SREE BABA LOKENATH BROHMOCHARY PUJA LIST OF BANGLA

SL. No.	Puja/Broto	Date (Bangla)	Date (English)	Day	Tithi (Ontario Time)
1.	Tirodhan Dibos	19 Joisttho	02 June, 2016	Thursday	Puja : Evening
2.	ProdeepUtsob	19 Kartik	05 November, 2016	Saturday	Puja : Evening
3.	PadukaUtsob	12 Falgun	25 February, 2017	Saturday	Puja : Evening